চিত্রজগতে বিশেষ পরিচিত—

কুমার **প্রমথেশ** বড়ুয়া

মহাশয়কে

আমার

"সান্ধ্যদীপ"

নামক উপন্যাস খানি

উৎসর্গ করিলাম

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

কলিকাতা
১১, ২, ৪৬

১

রাত্রির অন্ধকার আজ কেমন ঘন হইয়া আসিয়াছিল, এমন খুব কম দিনই দেখা যায়।

কৃষ্ণা জানালার কাছে দাঁড়াইয়া একবার আকাশের পানে তাকাইল। আকাশে নিকষ কালো মেঘ, একটীও তারা দেখা যাইতেছিল না, পূর্ণিমার চাঁদ দেখা অনেক দূরের কথা। খানিক আগে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেছে, বাড়ীর পিছনের ডোবায় অসংখ্য ভেককূল মহাসমারোহে চীৎকার স্বরু করিয়াছে।

যাদব বারাণ্ডায় বসিয়া ঝিমাইতেছে, মা বিছানায় পড়িয়া আছেন।

ওপাশের ঘরে একটা কি শব্দ হইতেই যাদবের তন্দ্রা ছুটিয়া গেল, কৃষ্ণাও ফিরিয়া চাহিল।

যাদব লণ্ঠনটা হাতে লইয়া পাশের ঘর দেখিতে গেল। গৃহপালিত বিড়ালটা মেঝেয় বসিয়াছিল, শিকারের জন্য সম্ভব সেই লাফাইয়াছিল, কয়েকটা হাঁড়ি কলসী মেঝেয় পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে দেখা গেল।

বিড়ালটাকে তাড়াইয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া যাদব ফিরিয়া আসিল, লণ্ঠন বারাণ্ডায় রাখিয়া সে ঘরের মধ্যে একবার উঁকি দিল—"মা ঘুমাচ্ছেন দিদি, ওষুধটা খাওয়ানোর সময় হয়েছে না?"

কৃষ্ণা দেয়ালের ছোট ঘড়িটার পানে তাকাইয়া বলিল, একটু পরে খাওয়াবো যাদবদা, দশ পনেরো মিনিট হলেই হল।"

রোগিনী ঘুমান নাই, পাশ ফিরিলেন—

'কৃষ্ণা—"

এই যে মা, আমি এখানেই আছি—" কৃষ্ণা মায়ের উপর ঝুঁ পাড়ল। কপালের উপর দু'চার গাছি চুল আসিয়া পড়িয়াছিল, সে সরাইয়া দিতে দিতে বলিল, "আর একবার ওষুধ খেতে হবে যে বিকেল হতে তুমি এত ঘুম ঘুমিয়েছ, ওষুধ খাওয়াতে পারি ডাক্তার দাদু এসেছিলেন, তিনি ঘুম ভাঙ্গিয়ে ওষুধ দিতে বারণ কর তাই তোমাকে আর ডাকিনি। এখন ওষুধটা খেয়ে নাও মা।"

রোগিনী মুখ বিকৃত করিলেন, বলিলেন, "কেবল ওষুধ ওষুধ। দেখছিস আমার খাওয়ার ইচ্ছে নেই, আমি আর বাঁচ শেষ সময়টায় আর কতকগুলো ওষুধ কেন খাওয়াচ্ছিস কৃষ্ণা?"

কৃষ্ণা রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "বাঁচবে না কে বললে মা, তুমি নিজে ব তো হবে না, ডাক্তারদাদু বলেছেন এর চেয়ে বেশী অসুখ কত লে হয়; তারা তো আবার বেঁচেও ওঠে।"

"বেঁচেও ওঠে—"

মায়ের মৃত্যুমলিন ওষ্ঠে হাসি ফুটিয়া উঠিল—"নারে না, ওসব বলে কাকামণি তোকে ভুলিয়েছে। আমার দেহের অবস্থা আমি বুঝি, আর কেউ তা বুঝবে না। আমি নিজে বেশ বুঝতে পারছি—

বলিতে বলিতে মায়ের দৃষ্টি কন্যার মুখের উপর পড়িল, থামিয়া গেলেন।

কৃষ্ণার যে হাতখানা তাঁহার বুকের উপর পড়িয়াছিল, সেই হাতের উপর নিজের শীর্ণ হাতখানা রাখিয়া ক্ষীণ আর্দ্রকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "ওই জন্যেই তোকে কোন কথা বলিনে কৃষ্ণা, অমনি চোখের জল ফেলতে লাগলি। এখনও সময় আছে, আমার শুনে রাখ, তোর তাতে ভালোই হবে।"

কৃষ্ণা চোখ মুছিল।

মা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিলেন—

বলিলেন, "কোনদিন তোকে কোন কথা বলিনি, কিন্তু এখন আর না বললে চলবে না। তোর বাপকে তুই কখনও দেখিস নি কৃষ্ণা, আমিও তাঁর সম্বন্ধে কোন কথা কোনদিন তোকে বলিনি, বলবার দরকারও হয়নি। আজ সব বলে যাওয়ার সময় হয়েছে, না বলে আমি মরতে পারব না।"

কৃষ্ণা বলিল, "এখন থাক মা, পরে তুমি একটু সুস্থ হ'লে ব'লো।"

মা শুষ্ক হাসি হাসিলেন, "এর পর,—এর পর কি আর সময় পাবি কৃষ্ণা, এর পর হয়তো যে দিন আসবে সেই দিনকেই আমি দেখতে পাব না। সামনে যে দিন এগিয়ে আসছে তার জন্যে তোকে প্রস্তুত হতেই হবে, নইলে বড় বিপদে পড়ে এর পর পথ নির্দ্দেশ করতে পারবি নে।"

সে এক মস্ত বড় ইতিহাস,—

কৃষ্ণার মায়ের যখন বিবাহ হয়, শ্বশুরের অবস্থা বেশ ভালোই ছিল, কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর সেই সব সম্পত্তি স্বামী রাধাচরণ উড়াইয়া দিয়াছেন এবং সন্তানসহ স্ত্রীকে একদিন তাড়াইয়া দিয়াছেন। তাই এ

সংবাদ পাইয়া ভগিনীকে নিজের নিকট লইয়া আসেন এবং তাহাকে দেখাশোনা করেন। তিনি রেঙ্গুনে কাজ করেন, ভগিনী ও ভাগিনেয়ীর খরচ সেখান হইতে পাঠান—তবে দিন চলে। ইহার মধ্যে রাধাচরণ দুইখানা পত্র দিয়াছেন, কন্যাকে তিনি নিজের কাছে লইয়া যান, কিন্তু মা পাঠান নাই, স্পষ্টই জানাইয়াছেন কন্যার উপর কোন অধিকার নাই।

যদিন তিনি বাঁচিয়া ছিলেন রাধাচরণ আসেন নাই, তাঁহার মৃত্যুসংবাদ পাইলেই যে আসিয়া পড়িবেন, তাহাতে কৃষ্ণার মায়ের সন্দেহ নাই।

এতদূর পর্যন্ত পরিচয় দিয়া মা রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "দিন পনেরো আগে শুনতে পেলুম তিনি নাকি তোর বিয়ের কথাবার্ত্তা ঠিক করেছেন; পাত্রের কথাও শুনেছি কৃষ্ণা, কিন্তু আমি চাইনে—"

বুকে অত্যন্ত যন্ত্রণা অনুভূত হওয়ায় তাঁহার মুখ হইতে আর কোন কথা বাহির হইল না, কেবল একটা অস্পষ্ট শব্দ বাহির হইল—"উঃ—"

কৃষ্ণা ব্যাকুল ভাবে বলিল, "থাক মা, আর ওসব কথায় দরকার নেই, তুমি ঘুমোও মা—"

মায়ের বুকে সে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

খানিকক্ষণ পরে একটা দম লইয়া মা বলিলেন, "ঘুমাব বই কি মা, নিশ্চিন্ত হ'য়েই ঘুমাব। তুই একবার যাদবকে ডাক, আমি তাকে একটা কথা বলি, এর পরে আর কথা বলবার সময় পাব কি না কে বলতে পারে।"

যাদব বারাণ্ডার দেয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া একটু তন্দ্রা দিতেছিল, কৃষ্ণার আহ্বানে তাহার তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে দিদিমনি ?"

কৃষ্ণা বলিল, "মা তোমায় একবার ডাকছেন যাদব দা, কি কথা বলবেন, শুনে যাও।"

যাদব ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল।

কৃষ্ণা বলিল, "যাদব-দাকে কি বলবে মা, যাদবদা এসেছে—বল।"

মায়ের চক্ষু ক্লান্তি ভরে মুদিয়া আসিতেছিল, "জোর করিয়া তিনি চাহিলেন।" এসেছো যাদব, "তোমার সঙ্গে কথা বলব বলে তোমায় ডেকেছি। আমার কৃষ্ণা রইলো, যতদিন না দাদা ফিরে আসেন, তুমি ওকে দেখো। তুমি তো আমার সব কথাই জানো যাদব— তোমাকে বেশী বলবার দরকার নেই, কৃষ্ণার যাতে ভালো হয়, তুমি তাই করো।"

তিনি পাশ ফিরিয়া শয়ন করিলেন।

২

রজনী প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণার মায়ের জীবন প্রদীপ নিভিয়া গেল।

যাদবের চেষ্টায় লোকজন সংগ্রহ হইল, কৃষ্ণা নিঃশব্দে সব কাজ করিয়া গেল, তাহার পর গৃহে ফিরিয়া শুইয়া পড়িল।

সমস্ত দিনটা এমনই নিঃশব্দে কাটিয়া গেল, রাত্রিও পার হইয়া গেল।

কৃষ্ণা ভোর বেলায় চোখ মেলিল—

আস্তে আস্তে বাহিরে আসিয়া দেখিল, বারাণ্ডায় যাদব শুইয়া পড়িয়া ঘুমাইতেছে।

বেচারা যাদব,—

কৃষ্ণা কাল জলস্পর্শ করে নাই, যাদবও সঙ্গে সঙ্গে উপবাস করিয়া আছে। সন্ধ্যার পরে কৃষ্ণা একবার বলিয়াছিল, "তুমি কিছু খেলে না যাদবদা; উপোস করে সারা দিনটা গেল, রাতটাও কাটবে?"

যাদব একটু হাসিয়াছিল, বলিয়াছিল, "আমার এমন কিছু কষ্ট হয়নি দিদি, এ রকম উপোস দেওয়া আমার ঢের অভ্যেস আছে। জন্ম হতে এই পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন বছর ধরে কত আসছে জন্মাষ্টমী শিবরাত্রির উপোস, তার কি সংখ্যা আছে কিছু? কষ্ট আমার হয়নি দিদি, হয়েছে তোমার, কখনও তো উপোস করনি—"

কৃষ্ণা চুপ করিয়া গিয়াছিল।

সত্যই কখনও সে উপবাস করে নাই, মা তাহাকে কিছুই করিতে দেন নাই, পড়াশুনা ও সংসারের কাজকর্ম্ম লইয়া দিন কাটাইয়াছে।

মামা ব্রজনাথ বিবাহ করেন নাই, জীবনভোর যাহা কিছু উপার্জ্জন করিয়াছেন তাহা পাঁচজনের জন্যই ব্যয় করিয়া আসিতেছেন। তিনি রেঙ্গুনে কাজ করেন, কদাচিত একবার দেশে আসিয়া দুই এক মাস কাটাইয়া যান। সম্প্রতি তিনি পত্র দিয়াছেন; এত শীঘ্র ইহার মধ্যে যে এই বিপদ ঘটিবে তাহা তিনি বা আর কেহই জানেন নাই। কৃষ্ণা দুদিন আগে তাঁহাকে মায়ের অবস্থা জানাইয়া পত্র দিয়াছে।

এই পরিবারের বহু পুরাতন ভৃত্য যাদব।

ব্রজনাথ এবং কমলাকে সে হাতে করিয়া মানুষ করিয়াছিল, [illegible]াথের সঙ্গে সে রেঙ্গুনেও দীর্ঘ দিন কাটাইয়া আসিয়াছে। রাধাচরণ [illegible] ভগিনীর উপর নির্য্যাতন করিয়াছেন এই সংবাদ পাইয়া [illegible] রেঙ্গুন হইতে আসিবার সময় যাদবকে লইয়া আসেন এবং [illegible] নিজের বাড়ীতে রাখিয়া যাদবকে তাহার প্রহরী রাখিয়া [illegible]ন ফিরিয়া যান। রেঙ্গুনে তাঁহার বিশাল কাঠের কারবার চলি[illegible]ানে বেশী দিন অনুপস্থিত থাকা তাঁহার চলে না।

[illegible]ণের লোক; নিজের দিকে কোনদিন তিনি দৃষ্টিপাত করেন [illegible] লইয়াই তাঁহার সংসার। এই পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সেও [illegible] শিশুর মত সরল ও উদার। ভগিনী ও যাদব বিবাহ দি[illegible]ক চেষ্টা করিয়াছিলেন, সে প্রস্তাব তিনি

হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন, স্পষ্টই জানাইয়াছেন বিবাহ তিনি করিবেন না।

ভগিনীকে তিনি বড় ভালোবাসিতেন, ছন্নছাড়া জীবনে বন্ধন আনিয়া দিয়াছিল এই মেয়েটাই, তিনি কমলা[illegible] রেঙ্গুনে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু কমলা রাজি হন নাই। পিতৃপুরুষের ভিটায় একজন কেহ না থাকিলে সন্ধ্যা পড়িবে না, বাড়ী ঘর নষ্ট হইয়া যাইবে, তাহা ছাড়া মেয়ে বড় হইয়া উঠিবে—তাহার বিবাহ দিতে হইবে, এই সব কারণ দেখাইয়া কমলা সেই বর্ম্মীদের দেশে যাইতে রাজি হন নাই।

ব্রজনাথ প্রতিমাসে টাকা পাঠাইয়া দেন,—তাহাতে স্বচ্ছন্দে দিন কাটিয়া যায়।

কৃষ্ণা স্থানীয় স্কুল হইতে ম্যাট্রিক পাশ করিয়া আই-এ পড়িবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, মামার সম্মতিও সে পাইয়াছিল। আজ[illegible] কার দিনে কেবল রূপ থাকিলেই চলে না, রূপেয়া এবং [illegible] দরকার, তাহা বুঝিয়া মামা তাহাকে পড়িতে অনুমতি দিয়াছিলেন[illegible]

কমলার ইচ্ছা ছিল না, কন্যার বিবাহটা তাড়াতাড়ি [illegible] তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন ; মামার অনুমতি পাইয়া কৃষ্ণা [illegible]ক পরাস্ত করিয়াছিল। ঠিক হইয়াছিল সে বেথুনে পড়িবে, [illegible]াম হইতে ট্রেণে কলিকাতায় যাতায়াত করিবে, যাদব তাহার [illegible]ব।

মামা তাহাকে কলেজে ভর্ত্তি হইতে বলিয়াছি[illegible]ক দিন যাতায়াত করার পরেই কমলার ব্যারাম হইল, [illegible]ড়াও বন্ধ হইয়া গেল।

সেদিনে যাদবই হবিষ্যের সব যোগাড় করিয়া দিল—

কৃষ্ণা কোন রকমে আহার্য্য গলাধঃ করিল মাত্র।

যাদব বুঝাইল—অত ভেঙ্গে পড়ো না দিদিমণি, আমি বাবুকে কালই একখানা পত্র দিয়েছি, তাতে সব খুলে লিখেছি, পত্র পেয়েই বাবু যা হয় একটা কোন ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু আর একটা কথা আছে যে,—তোমার বাবাকে একটা খবর দেওয়া দরকার মনে করি—গাঁয়ের সবাই বলছেও তাই।"

কৃষ্ণা বিবর্ণ মুখে বলিল, "বাবাকে খবর দিলেই তিনি হয়তো আসবেন আর আমাকে তাঁর ওখানে নিয়ে যাবেন।"

যাদব একটু হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ, নিয়ে যাওয়া বড় মুখের কথা কি না। তুমি তো এতটুকু মেয়েটি নও দিদি, যে তোমায় জোর করে ধরে নিয়ে গেলেই হল, নিয়ে যাওয়ার জোর থাকা চাইতো।"

কৃষ্ণা বলিল, "জোর তো তাঁর আছে।"

"জোর আছে—"

যাদব হাসিয়া উঠে, তাহার মোটে বিশ্বাস হয় নাই। যে পিতা কন্যাকে একবার মুহূর্ত্তের জন্য মাত্র দেখিয়া ছিল; যে কোনদিন কন্যার একটা দিনের ভার পর্য্যন্ত লয় নাই, আজ সে আসিবে জোর করিয়া অধিকার স্থাপন করিতে,—এত বড় অবিশ্বাসের কথা আর নাই—যাদব তাহাই মনে করে।

কৃষ্ণা বিমর্ষ মুখে বলিল, "জোর আছে বই কি, তুমি বরং শঙ্করদাকে একবার জিজ্ঞাসা করে দেখো। শঙ্করদা যে পড়েছেন, তিনি সব জানেন। বাবা যখন আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে প্রথম হতে চেষ্টা

করেছেন—হ্যাঁ, একটা কথা যাদবদা, বাবা দিন পনেরো ষোল আগে মাকে যে পত্রখানা দিয়েছিলেন, মা বলেছেন, সে পত্রখানা আমি একবার দেখতে পারি কি ?”

যাদব বলিল, “খুঁজে দেখতে হবে, মা হয়তো তাঁর বাক্সের মধ্যে সে পত্র রেখেছেন।”

কেবল পিতার পত্রখানা খুঁজিবার জন্যই কৃষ্ণা এই প্রথম মায়ের বাক্স খুলিল।

কোনদিন এ বাক্স সে খুলে নাই, মা নিজেই এবাক্স খুলিতেন দিতেন,—তাও প্রায় নয়—কদাচিত।

বাক্স খুলিয়া সে দেখিতে পাইল, কয়খানা কাপড়; ইহার মধ্যে একখানা বেনারসীও আছে, সম্ভব এ কাপড়খানা মায়ের বিবাহের শাড়ি, চন্দনের দাগ সে কাপড়ে লাগিয়া আছে।

এই কাপড় গুলির নিচে রহিয়াছে কয়েকখানা পত্র এবং খান তিন চার ফটো।

কৃষ্ণার পিতার ফটো,—এইখানি সম্ভব বিবাহের পরই তোলা, তাহার মা বসিয়া আছেন, চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইয়া তাহার পিতা।

কি সৌন্দর্য্যই না ছিল কৃষ্ণার মায়ের, এ রূপ সে দেখিতে পায় নাই, এমন হাসি মায়ের মুখে কোনদিন দেখে নাই।

মা এসব তাহার কাছে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, অথচ নষ্ট করেন নাই, ইহার কারণ তাহার কাছে অজ্ঞাত রহিয়া গেল।

পত্র কয়খানি হাতে লইয়া সে খানিকটা ইতস্তত: করিল, এ পত্র

পড়া উচিত কিনা ; কিন্তু উপায় নাই, এ পত্র না পড়িলে সে বুঝিতে পারিবে না পিতা কি লিখিয়াছেন, ব্যাপারটা কি ঘটিয়াছে।

তারিখ দেখিয়া সে প্রথম পত্র খানি পড়িল,—অনেক দিন আগে-কার পত্র, দীঘ চতুর্দ্দশবৎসর পূর্ব্বের লেখা। পিতা স্ত্রীকে অত্যন্ত কটুভাবে লিখিয়াছেন। তিনি স্ত্রীর কাছে পাঁচশত টাকা চাহিয়াছেন, দেনায় নাকি তাঁহার মাথার চুল পর্য্যন্ত বিকাইয়া যায়, এ টাকা দিতে না পারিলে তাঁহাকে জেলে যাইতে হইবে। এতদূর পর্য্যন্ত লিখিয়া তিনি ভয় ও দেখাইয়াছেন—যদি এ টাকা তাঁহাকে না দেওয়া হয় তিনি যেমন করিয়াই হোক টাকা আদায় করিবেনই—ইহার জন্য যদি স্ত্রীর নামে কলঙ্ক দিতে হয় তাও করিবেন।

দ্বিতীয় পত্র খানা তিন বৎসর পূর্ব্বে লেখা—তিনি লিখিয়াছেন—স্ত্রীর নামে মিথ্যা কলঙ্কারোপ করিয়া তিনি অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়াছেন, সে জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন। যদি স্ত্রী অনুমতি দেন তিনি দু' একদিনের মধ্যে এখানে আসিবেন এবং তখন সাক্ষাতে যাহা হয় কথা হইবে। ইহার মধ্যে যদি তিনি কোন রকমে একশত টাকা যোগাড় করিয়া রাখেন, তাহা হইলে বড় ভালো হয়—ইত্যাদি—ইত্যাদি।

ইহার পরই তৃতীয় পত্র—

সেখানি মাত্র দিন ষোল সতেরো পূর্ব্বে আসিয়াছে। এখানিও তোষামোদ পূর্ণ—।

রাধাচরণ লিখিয়াছেন—তিনি কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন, ছেলেটী খুবই ভালো। ইহার জন্য স্ত্রীর অনুমতি চাহিবার তাঁহার

কোন আবশ্যক নাই, কারণ কন্যা বড় হইয়া উঠিয়াছে, এখন তাহাকে তাহার মায়ের নিকটে তিনি রাখিতে চাহেন না ইত্যাদি।

এই পত্রের ভাবে স্পষ্টই বুঝা যায়—তিনি কৃষ্ণার মায়ের চরিত্রে যে কলঙ্ক দিয়াছেন তাহারই জন্য কন্যাকে এখানে রাখিতে চাহেন না, তাহাকে বিবাহ দিয়া সংসারী করিতে চাহেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি শীঘ্রই আসিতেছেন; কমলা আপত্তি করিলেও সে আপত্তি টিকিবে না। তিনি জোর করিয়া কন্যাকে লইয়া যাইবেন।

কৃষ্ণা নিস্তব্ধে বসিয়া রহিল।

এই তিনখানি পত্রেই সে তাহার পিতার পরিচয় পাইয়াছে, মায়ের জীবন যে কতখানি দুঃখবেদনার মধ্য দিয়া কাটিয়াছে তাহা বুঝিয়া ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে। আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছে—যে মানুষটী সর্ব্বংসহা বসুমতীর মত এতখানি দুঃখ বেদনা বুকে বহন করিয়া গিয়াছে, কন্যা হইয়া এত নিকটে থাকিয়াও সে তাহা একদিনের জন্য বুঝিতে পারে নাই।

তবে এটুকু সে জানে কদাচিত কোন গভীর রজনীতে ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়া সে মায়ের সাড়া পাইয়াছে, আগে সে বুঝে নাই, আজ বুঝিয়াছে মা রাত্রে ঘুমান নাই; দিনের বেলা সকলের মাঝে থাকিয়া যে সব কথা তাঁহার মনে উঠিয়াও মিলাইয়া যাইত, নিশীথে নিস্তব্ধ শয্যায় সেই সব কথা তিনি ভাবিতেন, চোখের ঘুম ছুটিয়া যাইত, হয়তো কত চোখের জলও ঝরিয়া ঝরিয়া উপাধান সিক্ত করিয়া দিত।

কৃষ্ণার চোখে জল আসিতেছিল;—

সে চোখ মুছিয়া পত্রগুলি যেমন ছিল তেমনই ভাবে রাখিয়া তাহার উপর কাপড়গুলি চাপাইয়া বাক্স আবার বন্ধ করিয়া দিল।

৩

ইচ্ছা না থাকিলেও বাধ্য হইয়া পিতাকে পত্র লিখিতে হইল, জানাইতে হইল, কমলা ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন—।

তাহারই দুই তিনদিন পরে রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তিনি যে আসিবেনই এ জানা কথা, আসার আশা করিয়াও তাঁহার আসায় কৃষ্ণা মোটেই খুসি হইতে পারে নাই, যাদবই তাঁহাকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিল।

স্থূল ও বেশ গোলাকার চেহারা, লম্বা তিনি নন; বিবাহের সময়কার যে ফটো কৃষ্ণা দেখিয়াছে তাহার সহিত এ চেহারার মোটেই সাদৃশ্য নাই। যাদব পরিচয় করাইয়া না দিলে কৃষ্ণা যে মোটেই চিনিতে পারিত না—এ কথা সত্য।

এই লোকটীকে প্রণাম করার প্রবৃত্তি কৃষ্ণার ছিল না—ইঁহার জীবনের যে দিনের পরিচয় সে পাইয়াছে তাহাতে ভক্তি শ্রদ্ধার ভাবও মনে জাগেনা। তথাপি সে কেবল কর্ত্তব্য রক্ষার জন্যই প্রণাম করিল, রাধাচরণ তাহার মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

যাদবের পানে তাকাইয়া বলিলেন, "বুঝলে যাদব, আমার এমন লক্ষ্মী প্রতিমার মত মেয়ে থাকতেও আমি কি না বাউণ্ডুলের মত

বেড়াচ্ছি,—সে সব কথা মা লক্ষ্মী না জানুক—তুমি তো জানো। লোকে কত কথাই না বলে, একটা কথা বলার মত মুখ তো আমার নেই, মুখ বুজেই থাকি, যে যা বলে সয়ে যাই।"

তিনি একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিলেন—

"যাক গিয়ে, এক ছিলিম তামাক দাও হে যাদব, এতখানি পথ আসা, সেই নদে জেলার চৌগাছা হতে একেবারে তোমাদের সোনাপুর পর্য্যন্ত, তামাক না খেয়ে প্রাণ যায়। তুমি তো জানো বাপু, তামাক না খেলে আমার যা কষ্ট হয়—"

ব্যস্ত হইয়া যাদব বলিল, "তা তো জানি বাবু, হুঁকো কলকের পাট তো এবাড়ীতে নেই, দেখি একটা জোগাড় করে আনি।"

রাধাচরণ বলিলেন, "হ্যাঁ বাপু, একটু তাড়াতাড়ি করেই জোগাড়টা করো, আর বেশীক্ষণ বামুনকে কষ্ট দিয়ো না। উঃ, পথ তো নয়—তুমি তো জানো যাদব, বাড়ী হতে ইষ্টিশানে আসা—সে কি বড় কম, তার পর এই ট্রেনের কষ্ট,—প্রাণ যেন বার হয়ে গেছে।"

যাদবকে আড়ালে ডাকিয়া কৃষ্ণা বলিয়া দিল, "হুঁকো চেয়ে আনার চেয়ে যদি কিনতে পাওয়া যায় বাজারে, তুমি তাই একটা কিনে নিয়ে এসো যাদব দা—।"

যাদব বলিল, "সে জন্যে তোমার কিছু ভাবতে হবেনা দিদি, যা করবার আমি সব ঠিক করে দেব এখন।"

সে বাহির হইয়া গেল এবং খানিক্ষ বাদেই হুঁকা ও তামাকের সমস্ত সরঞ্জাম লইয়া ফিরিল। নূতন হুঁকা কলিকা দেখিয়া রাধাচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "একেবারে টাটকা দেখছি যে—অনর্থক খরচ

করলে যাদব, তোমাদের পাড়ায় হুঁকো কলকে পাওয়া যায় না এমন পাড়ায় তোমরা বাস কর হে ?—তাজ্জব ব্যাপার।"

সবিনয়ে যাদব বললে, "আজ্ঞে না, পাওয়া যায় বই কি, তবে আপনার জন্যে নূতন দেখেই আনলুম। বামুন মানুষ,—তার ওপরে ভশ্চায্যি বামুন আপনি, আপনাকে তো যার তার হুঁকো এনে দিতে পারি নে। আর এর জন্যে আপনার সঙ্কুচিত হতে হবে না,—এটা যখন আপনারই হল, আপনি বাড়ী যাওয়ার সময় এটাকে নিয়ে যাবেন, ফেলে যাবেন কেন ?"

ভারী খুসি হইয়া রাধাচরণ বলিলেন, "অগত্যা তাই নিয়ে যেতে হবে। তবে বুঝলে কি না—যাওয়ার সময় হয় তো অনেক জিনিষ হয়ে যাবে, তার মধ্যে ওই ছোট্ট হুঁকোটাকে সামলানোই হবে মুস্কিল।

যাদব তাঁহার কথার অর্থ বুঝিল না, বলিল, "মুস্কিল আর কিসের আপনার তো লাগবেই পথে! এতখানি পথ, এতটা রেলে গিয়ে ইষ্টিশানে নেমে আবার সেই ছয় সাত ক্রোশ যাওয়া; হুঁকো কলকে থাকলে না হয় খানিকটা তামাক খেলেন, ক্লান্তিটা দূর হবে।"

সে তাড়াতাড়ি তামাক সাজিয়া দিল।

তামাক টানিতে টানিতে রাধাচরণ বলিলেন, "একটা কাজ কোরো বাপু, এই হুঁকোটায় একটা কড়ি বেঁধে রেখো,—মা লক্ষ্মীকে সর্ব্বদা সঙ্গে রাখা ভালো।"

"যে আজ্ঞে" বলিয়া যাদব ভিতরে চলিয়া গেল।

নেহাৎ কর্ত্তব্যের দায়ে পড়িয়াই খবর দিতে হইয়াছে এবং তিনি

র কোন গূঢ় মতলব লইয়া এখানে আসিয়াছেন, প্রথমটা তাহা
ঝিতে না পারিলেও এখন সে বুঝিয়াছে। হুঁকা আনিতে গিয়া সে
ট করিয়া একবার গাঙ্গুলী বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল। এই বাড়ীরই
হলে শঙ্কর, সে কলিকাতায় থাকে তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিতে গিয়াছিল,
ঞ্চার পরে রাধাচরণের যে পিতৃত্বের অধিকার আছে, সেই টুকুর জোরে
নি কি তাহাকে অনায়াসে নিজের কাছে লইয়া যাইতে পারেন ?

শঙ্করের সঙ্গে দেখা হয় নাই, সে কলিকাতায় গিয়াছে ফিরিয়া
াসিবে সন্ধ্যার সময়ে, কাজেই জিজ্ঞাসা করাও হয় নাই।

হবিষ্যের যোগাড় করিয়া কৃষ্ণা বসিয়াছিল—

নিতান্ত নিস্পৃহ ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "হুঁকো এনে দিয়েছো
দবদা ?"

যাদব উত্তর দিল, "অনেকক্ষণ আনা হয়েছে, তার পরে ওঁর দু' চার
লিম তামাক খাওয়াও হয়ে গেছে দিদি।"

মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল, "একটা কথা মা মণি, মনে
কটা সন্দেহ হচ্ছে।"

উৎকণ্ঠিত হইয়া কৃষ্ণা বলিল, "কি সন্দেহ যাদবদা ?"

যাদব বলিল, "উনি বলছেন যাওয়ার সময় ওঁকে নাকি অনেক জিনিস
র নিয়ে যেতে হবে, কথাটার মানে ঠিক বুঝছি নে।"

"কথাটার মানে—?"

কৃষ্ণা হাসিল, "মানেটা বুঝতে বেশী দেরীও তো হওয়ার কথা নয়
বদা, জলের মত সোজা, কাঁচের মত স্বচ্ছ, অতি সহজেই এপার
ার দেখা যায়। আমি আগেই এ কথা বলেছিলুম যাদবদা।"

সে ফিরিয়া উনানে আগুন দিতে বসিল।

যাদব উত্তেজিত হইয়া বলিল, "এ কখনো হতে পারে না দিদিমণি, কক্ষনো না। বাবুকে চিঠি লেখা হয়েছে, তিনি আসুন, তারপরে যদি তিনি বলেন, তখন বাধ্য হয়ে যেতে হবে বই কি।"

কৃষ্ণা কোন উত্তর দিল না।

যাদব উৎসাহিত ভাবে বলিল, "আমার মনে হয়, বাবু কখনও তোমাকে চৌগাছায় যেতে দেবেন না; নিজের কাছে সেই রেঙ্গুনে নিয়ে যাবেন। আরও তো কতবার নিয়ে যাওয়ার কথা বলেছিলেন কেবল মা মনিই যেতে চাননি এই ভিটে ছেড়ে। মা মনি নেই এ খবর পেয়ে বাবু কক্ষনো রেঙ্গুনে থাকতে পারবেন না, যেদিন পত্র পাবেন সেইদিনই রওনা হবেন। তোমাকে তিনি সেই ম্যালেরিয়ার ডিপো চৌগাছায় পাঠিয়ে দিতে রাজি হবেন না, নিশ্চয়ই নিজের কাছে নিয়ে যাবেন।"

কৃষ্ণা একটা নিঃশ্বাস ফেলিল—।

সেদিন আহার করিতে বসিয়া পঞ্চ ব্যঞ্জনের পানে তাকাইয়া রাধাচরণ চোখের জল ফেলিলেন—"এমন খাওয়া অনেককাল কপালে জোটেনি মা, পাঁচ তরকারী রেঁধে কেউ আমায় ভাত দেয় না, নিজে যা হয় সিদ্ধ করে কোন রকমে দুটো ভাত খাই, আমার পিসিমা তোমার ঠাকুরমা যে তিন বছর মারা গেছেন, সেই তিন বছর এই একই ধারা চলেছে।"

নিতান্ত আবশ্যকীয় কথা ছাড়া কৃষ্ণা কথা বলে নাই, এত বড় দুঃখেও সে এতটুকু সহানুভূতি দেখাইল না। আহার করিতে করিতে

রাধাচরণ মুখ তুলিয়া হু' তিনবার তাহার মুখের পানে তাকাইলেন, এ যেন পাথরে গড়া মূর্ত্তি, মনও বোধ হয় পাথরে তৈরী, সেখানে কোন চিহ্ন হয়তো পড়ে না—। পরদিন এক সময়ে যাদব যখন তামাক দিতে আসিয়াছিল, তখন তিনি তাহাকে পাকড়াইলেন,—"আঃ, তোমার দেখা তো মোটেই পাওয়ার যো নেই যাদব, হুদণ্ড যে কথাবার্ত্তা বলব তারও যো নেই। বস—হুটো কথাবার্ত্তা বলা যাক।"

সময় যদিও যথেষ্ট ছিল তথাপি যাদব তাঁহার নিকটে বড় বেশী ঘেঁসে নাই, তাঁহাকে এড়াইয়া চলিয়াছিল। কি জানি তিনি কি কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বসিবেন, কি করিবেন—, যাদব কি উত্তর দিয়া ফেলিবে তাহাই বা কে জানে। বাবুকে সে যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি আসিতে লিখিয়াছে, তিনি আসিয়া যা হয় ব্যবস্থা করুন, কথাবার্ত্তা যা হয় বলুন, যাদব দূরেই সরিয়া থাক।

শুষ্ক মুখে সে বলিল, "কি করব বলুন বাবু, কাল বাদে পরশু দিন শ্রাদ্ধ, যে ভাবনা মাথায় চেপেছে, শ্রাদ্ধটা না শেষ হলে আর কথা বলবার সময় নেই।"

রাধাচরণ অবহেলার সুরে বলিলেন, "আরে নাও, শ্রাদ্ধের জন্যে আবার ভাবনা,—একদিনের মোকর্দ্দমা,—যেমন তেমন করে সেরে দিলেই চলবে। দেখতে দেখতে দশটা দিন হয়ে গেল—আঁ্যা—"

গুণ গুণ করিয়া তিনি সুর ভাঁজিলেন—

আজ ম'লে কাল হুদিন হবে
কেউ কোরনা গণ্ডগোল—

যদিও গানটা নেহাৎ আধ্যাত্মিক তথাপি এ সময় সুর ভাঁজা যাদবের ভালো লাগে না।

অপ্রসন্ন মুখে বলিল, "রাত পোয়ালেই দুদিন হয়ে যায় বাবু, এ তো তবু সাতটা দিন হল। আপনাদের বামুন জাতের এ তো অনেক ভালো, দশটা দিনের হ্যাঙ্গামা, এগার দিনে মেটে, আর আমাদের লম্বা একমাস এই বোঝা বয়ে চলতে হয়।"

রাধাচরণ বলিলেন, "এ বাপু তোমাদের অন্যায়, বামুনের সঙ্গে আর কারও মিল করা চলে না। বামুনের অশৌচের দিন কম, তার কারণ তাদের কাজ করতে হয় কত, অশৌচ নিয়ে অশুদ্ধ হয়ে বসে থাকলে কি চলে? যাক, বসো যাদব, দুটো কথা জানতে দাও। এসেছি পর্য্যন্ত তোমাদের কারও মুখে একটা কথা শুনতে পাইনি, ব্যাপারটা যেন কেমন খাপছাড়া লাগছে।"

অনিচ্ছাসত্ত্বেও যাদব বসিল।

রাধাচরণ বলিলেন, "তোমার বাবু তো এখন আসতে পারছেন না জানিয়েছেন, ভারি বিপদে পড়েছেন দেখলুম—"

যাদব একেবারে বিবর্ণ হইয়া উঠিল, হাঁফাইয়া উঠিয়া বলিল, "তার মানে? আপনি কি করে জানলেন বাবু বিপদে পড়েছেন, তিনি আসতে পারবেন না—"

রাধাচরণ গম্ভীর মুখে বলিলেন, "আরে বাপু না জেনেই কি বলছি? এই মাত্র তোমাদের গাঁয়ের পিয়ন এই পত্রখানা দিয়ে গেল, ওতেই পড়ে জানলুম।"

তিনি একখানা পোষ্টকার্ড যাদবের দিকে আগাইয়া দিলেন।

যাদবের হাত কাঁপিতেছিল, সে কার্ড খানা তুলিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

রাধাচরণ একটা আড়ামোড়া ছাড়িয়া বলিলেন, "ওতে এমন কিছু লেখা নেই, শুধু লেখা আছে ব্যবসার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, একটু সামলিয়ে না নিয়ে তিনি আসতে পারবেন না। আমি পড়ে শুনাচ্ছি বরং, তুমি শোন যাদব।"

শুষ্ক মুখে যাদব বলিল, "দিদিকে দেখাই গিয়ে, তিনিও তো খবর শুনবার জন্যে অস্থির হয়ে আছেন।"

সে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

যে কথা বলার জন্য তাহাকে ডাকা হইয়াছিল, তাহা আর বলা হইল না।

সান্ধ্যদীপ

শ্রাদ্ধ শেষ হইয়া গেল। মায়ের শেষ কাজ কৃষ্ণা একান্ত নিষ্ঠার সহিত বেশ একটু জাঁক জমকের সঙ্গেই করিল।

হাতে টাকা অথচ ছিল না। মামা যাহা কিছু দিয়া গিয়াছিলেন, মায়ের চিকিৎসায় তাহা খরচ হইয়া গিয়াছিল। কৃষ্ণার গলার যে ভারী নেকলেসটা ছিল, তাহাই বিক্রয় করিয়া সাতশত টাকা পাইয়া কৃষ্ণা সেই টাকায় মায়ের কাজ শেষ করিয়া দিল।

রাধাচরণ নমো নমো করিয়া সারিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহার মতে —মরা গরু কোনদিন ঘাস খায় নাই, খাইবেও না, তবে তাহাকে খাওয়াইবার জন্য এত মাথা ব্যথা কেন? যে মানুষ মরিয়া গেছে, তাহার তো কিছুই নাই, অনর্থক ঘটা করিয়া শ্রাদ্ধ করার প্রয়োজনটা কিসের?

কৃষ্ণা কেবলমাত্র বলিল—"এতে আমার মায়ের আত্মা তৃপ্ত হবে, শান্তি পাবে—"

আত্মার শান্তি তৃপ্তি,—

রাধাচরণ অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া উঠেন—তাঁহার সেই এক কথা—মরা মরু ঘাস খায় না, স্বর্গ নরক মানিয়া পদে পদে পা মানিয়া চলাই মানুষের অন্যায়।

এই লোকটীর ধৃষ্টতা কৃষ্ণা সহ্য করিতে পারে না। মায়ের সারা

জীবনটা এই লোকটী বিষময় করিয়াছিলেন, মরণের পরেও বাদ সাধিতে আসিয়াছেন।—

রুষ্ট কণ্ঠে সে বলিল, "আপনি শুনেছি দেবার্চ্চনা নিয়ে থাকেন, লোককে ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন, শাস্ত্র আলোচনা করেন, অথচ পাপ, পুণ্য, স্বর্গনরক, এসব কিছু মানেন না দেখছি।"

রাধাচরণ হঠাৎ যেন থতমত খাইয়া গেলেন, বলিলেন, "না না, আমার কথা নয়,—আমার সঙ্গে এ সব ব্যাপারের বা কথার কোন সম্পর্ক নেই, এ কথা আমি আগেই বলে রাখ্‌ছি বাপু। আসল কথাটা আমি এই মাত্র বলতে চাচ্ছি যে—"

কৃষ্ণা বলিল, "মরা গরু ঘাস খায় না, এ কথা আমিও জানি, তবু নাকি মানুষের মনে তৃপ্তি আসে না, তাই তারা অনেক কিছু করে মনের ক্ষোভ মিটায়। মরা মানুষের স্মৃতি রাখবার জন্যে চলে কত আয়োজন,—কত মন্দির তৈরী হয়, কত পথের নামকরণ হয়—সে সব কিছু আপনার অজানা নেই—।"

রাধাচরণ তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন, "আমি ওসব জানিনে বাপু, তোমার যা খুসি তুমি তাই কর। তোমার মা, তোমার টাকা, তুমি যা খুসি খরচ কর, আমার তাতে কিছু বলবার নেই।"

কি করিয়া কৃষ্ণা খরচ সংগ্রহ করিল তাহার সংবাদ যখন তিনি জানিতে পারিলেন, তখন তাঁহার দুই চোখ কপালে উঠিল, তথাপি তিনি তখন একটীও কথা বলিলেন না।

যাদবকে এক সময়ে নিরিবিলি পাইয়া তিনি বলিলেন, "এ সব ব্যাপার কি বলতো যাদব, এ সব কি ছেলে মানুষি? এই যে এত

বড় আয়োজনটা হল, গাঁ সুদ্ধ লোক খাওয়ানো, অত দান খয়রাত, এতে কি লাভ হল,—সেই কথাটাই জিজ্ঞেসা করি।"

যাদব চুপ করিয়া রহিল।

রাধাচরণ বলিলেন, "গয়না বিক্রী করে মায়ের শ্রাদ্ধ করায় মা কি স্বর্গলাভ করলে? এ সব নিছক পাগলামী ছাড়া আর কিছু নয়। আমি প্রথমেই বারণ করলুম,—প্রথমেই বললুম—নমো নমো করে সেরে দাও, এত গোলমালে দরকার নেই। মেয়েমানুষ কি না, কোন কথা যদি কানে তোলে; নিজের মতে যা বুঝবে তাইতো করবে—"

যাদব একটু উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল, বার বার দিদিমণির নিন্দা সে সহিতে পারিতেছিল না, বলিল, "পাগলামী বলবেন না,—এ করা কর্ত্তব্য বলেই দিদিমণি করেছে। আর এমন কি-ই বা বেশী দান খয়রাত করা হয়েছে বলুন, কাউকে শাল দোশালাও দান করেনি, হাতী ঘোড়াও দেওয়া হয়নি। জন কত বামুন আর ভিখিরী খেয়েছে মাত্র, আর তো কিছুই হয় নি।"

"না, কিছু হয়নি—"

রাধাচরণ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, "ওই ছোকরাটী কে বলতো বাপু, যে সমস্ত দেখা শোনা করছিল, সকলকে হুকুম করছিল? আমি কথা বলতে গেলুম, আমায় থামিয়ে দিয়ে বললে, "আপনি চুপচাপ ঘরে বসুন গিয়ে, যা করবার আমি করব এখন? ছোকরাটী কে,—তোমাদের কেউ যে হন না, তা আমি জানি, এ বংশের কোথায় কে আছে না আছে, তার নাড়ি নক্ষত্র আমার জানা আছে।"

যাদব বলিল, "আপনি শঙ্কর বাবুর কথা বলছেন বুঝেছি, উনি আমাদের গাঙ্গুলী বাড়ীর ছেলে, ছোটবেলা হতে খুব বেশী জানাশোনা কি না—সেই জন্যে এখানে থাকলেই এ বাড়ীতে যখন যা হয় উনিই দেখা শোনা করেন। মা যখন মারা যান তখন উনি কোথায় পাঁচ দিনের জন্যে গিয়ে ছিলেন, তাই না আমাদের একেবারে কষ্টের একশেষ হল।"

রাধাচরণ গম্ভীর মুখে বলিলেন, "বুঝেছি, রোগীর সেবা করতে পারে নি, মড়ার কাজ করতেও পারেনি,—শ্রদ্ধের সময় কোমর বেঁধে এসে লেগেছেন। বেশ ছেলে—খাসা ছেলে, কি করে—চাকরী টাকরী—"

যাদব তাঁহার পরিহাসভাব বুঝিয়া বেশ একটু উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, বলিল, "আজ্ঞে না, চাকরী করবার দরকার এখনই ওঁর হয়নি। বড় লোকের ছেলে, এম-এ,-ল, পড়েছেন, কলকাতাতেই হাইকোর্টে কাজ নিয়ে বসবেন এর পরে, এখন নানারকম কাজ করেন।

দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া রাধাচরণ বলিলেন, "একদমে হাইকোর্ট, ছোকরা আর এদিক ওদিক করবে না—অ্যাঁঃ—; যাক, কালে কস্মিনে যদি মামলা বাধে, ওর কাছে এলে বিশেষ কিছু ফি লাগবে না —কি বল?"

তাহার পর কতকটা যেন আপন মনেই বলিলেন, "আজ কালকার দিন—কি-ই বা হবে অতটা করে—উকিলের কি পয়সা আছে? আমাদের কেষ্ট নগরে রামযাদু বিশ্বেস, তারিণী বাড়ুয্যে, নিতাই হরি সেন—আরও কত উকিল যে ফ্যা ফ্যা করে বেড়াচ্ছে, তা যদি তুমি

একটিবার যেতে যাদব, নিজের চোখে দেখে আসতে। আমাদের কুলগত শিষ্য রয়েছে পরাণ সরকার, এমনি এম-এ,-ল, পাস করেছে —বিশ্বাস করবে না—তার ঘরে হাঁড়ি চড়ে না, একদিন কেন দু'দিন তিন দিন পর্য্যন্ত উপোস করে কাটে। ছ্যাঃ ছ্যাঃ, ওসব পড়ায় কোন লাভ নেই—কেবল বাপের পয়সা উড়ানো। যাক, বাপের পয়সা আছে, উড়িয়ে সার্থক করুক—বাপকে ধন্য করুক।

একটা হুঙ্কার দিয়া আড়ামোড়া ছাড়িয়া বলিলেন—"নাও হে যাদব, একছিলিম তামাক বানাও। আর এক কথা, এদিককার সব তো মিটলো, এখন তোমার দিদিমণিকে সব গুছিয়ে গাছিয়ে ঠিক ঠাক হতে বল,—আমি তো আর দেরী করতে পারিনে, করে কম্মে খেতে তো হবে। এই যে এসেছি, কত কাজ যে ক্ষতি হয়ে গেল, তার ঠিক নেই,—এরপর যদি যজমানগুলো হাতছাড়া হয়ে যায়—খাব কি, দিন চলবে কি করে?"

যাদব তামাক দিয়া গেল—।

রাধাচরণ হিসাব করিতেছিলেন—কি কি লইয়া যাওয়া যায়। জিনিসপত্র যাহা হইবে তাহাতে ট্রেণ ভাড়া যে কত পড়িবে, তাহাই কল্পনা করিয়া তিনি গলদ-ধর্ম্ম হইয়া উঠিলেন।

যাদব কৃষ্ণাকে জানাইল, রাধাচরণ বাড়ী যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন এবং কৃষ্ণাকে প্রস্তুত হইতে বলিয়াছেন।

রাধাচরণ যখন অন্যমনস্ক ভাবে হিসাব নিকাশে ব্যস্ত, সেই সময় কৃষ্ণা গিয়া দাঁড়াইল; শান্তকণ্ঠেই বলিল, "আপনি আমাকে নিয়ে যেতে চান, আমি প্রস্তুতই রয়েছি,—কবে যাবেন ঠিক করেছেন বলুন।"

রাধাচরণ যেন ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, হুঁকাটা একপাশে নামাইয়া রাখিয়া সোজা হইয়া বসিলেন, স্মিত হাসিতে তাঁহার মুখখানা ভরিয়া উঠিল, বলিলেন, "তুমি বলছো প্রস্তুত হয়েছো, কিন্তু আমি তো প্রস্তুত হওয়ার কিছুই দেখছিনে মা। সব জিনিস পত্র পড়ে রয়েছে, যাদবকে নিয়ে ওগুলো গুছিয়ে গাছিয়ে বেঁধে ছেঁদে নিলে ভালো হতো না?"

কৃষ্ণা শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "জিনিস পত্র আমার তো কিছু নেই?"

"কিছু নেই—মানে?"

রাধাচরণ যেন আকাশ হইতে পড়িলেন. "জিনিসপত্র নেই বলছো কি কৃষ্ণা মা? এই সব জিনিস পত্র,—বাক্স দেরাজ, বাসন পত্র—"

শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে কৃষ্ণা বলিল, "ভুল করছেন, এসব যা কিছু দেখছেন, আমার বা আমাদের কিছু নয়, এসব আমার মামার,—তাঁর জিনিসপত্র তিনি আমাদের ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। অধিকার নেই বলেই সব ফেলে রেখে চলে যেতে চাচ্ছি; যে পর্য্যন্ত মামা বাবু না আসবেন, যাদবই এসব দেখাশোনা করবে—এখানে থেকে।"

রাধাচরণ নিঃশব্দে রহিলেন।

কৃষ্ণা বলিল, "আমার মায়ের একটা বাক্স আছে তাতে আমার যা কিছু জিনিস আছে গুছিয়ে নিয়েছি; আপনি যখনই বলবেন আমি তখনই আপনার সঙ্গে চলে যাব।"

রাধাচরণ তাহার মুখের পানে চাহিলেন, স্বাভাবিক শান্ত মুখ—যেমন আর পাঁচজনের হয়, অন্তর তাহার এতখানি শক্ত তাহা বাহির হইতে দেখিয়া বুঝা যায় না।

রাধাচরণ শুনিয়াছেন কৃষ্ণা বেশ লেখাপড়া জানে, ম্যাট্রিক পাস করিয়া আই-এ পড়িতেছিল। কোনকালে তিনি লেখাপড়া জানা মেয়ে পছন্দ করেন নাই, লেখাপড়া শিখিলে মেয়েরা অত্যন্ত জ্যেঠা হইয়া পড়ে, এই তাঁহার বিশ্বাস এবং এই জন্যই তিনি চান মেয়েরা যেমন চিরকাল পায়ের তলায় পড়িয়া আছে তেমনই থাক,—পুরুষের সহিত তর্ক করিতে তাহারা যেন না দাঁড়ায়।

তিনি চাহিয়াছিলেন, তিনি যাহা বলিবেন কমলা তাহাই মনে প্রাণে মানিয়া লইবে, আদর্শ পতিপরায়ণা স্ত্রীর দৃষ্টান্ত দেখাইবে; কিন্তু কমলা তাহা পারেন নাই, অন্যায়কে ন্যায়রূপে মানিয়া লইবার মত দুর্ব্বলতা তাঁহার ছিল না; কাজেই স্বামীর সহিত তাঁহার মিল হইল না—সবল পুরুষ দুর্ব্বলা নারীর প্রতি শেষ অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন—তাঁহাকে দূরীভূত করিলেন।

মেয়েদের শিক্ষার উপর রাধাচরণের বিষদৃষ্টি, যে-সব মেয়েরা শিক্ষা লাভ করে, তাহাদের তিনি সহিতে পারেন না।

তথাপি কৃষ্ণার কথার উপর তিনি কথা বলিতে পারিলেন না, তাহাকে চটাইবার দুঃসাহস তাঁহার ছিল না। মনে মনে তিনি শাসাইলেন—"আগে তোমাকে চৌগাছায় নিয়ে যাই, তারপর তোমাকে দেখা যাবে।"

শঙ্করের সম্বন্ধে তিনি অনেকের নিকট হইতে অনেক কিছু খবর লইয়াছেন;—

এই ছেলেটিকে তিনি পছন্দ করিতে পারেন নাই, মনে হয় কৃষ্ণার

উপর ইহার প্রভাব বেশ-বেশী রকম আছে, শঙ্করের কথা কৃষ্ণা নতমুখে শুনিয়া যায়।

রাধাচরণ হাসিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু হাসি ফুটে নাই, সে চেষ্টার ফলে তাঁহার মুখখানা অধিকতর বিকৃত হইয়া উঠিয়াছিল মাত্র।

৫

পঞ্জিকা দেখিয়াই বুধবার সকাল বেলাই যাত্রার সময় নির্দিষ্ট করা হইয়াছিল।

বেচারা যাদব—

চোখের জলে তাহার বুক ভাসিয়া যাইতেছিল। কৃষ্ণার চোখে জল ছিল না, শুষ্ককণ্ঠে সে যাদবকে সান্ত্বনা দিল, "কেঁদো না যাদব-দা, মামাবাবুকে আমি সব খুলে পত্র লিখে দিয়েছি, তাঁকে জানিয়েছি আমার মায়ের কলঙ্ক মোচনের জন্যেই আমি যাচ্ছি, আমার নিজের দিক হতে তাঁকে আমি মুক্তি দিয়ে যাচ্ছি। তুমি তো জানো না যাদব-দা, উনি আমাকে সেদিন রাত্রে কত কথাই না শুনিয়েছেন—"

বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল।—সেদিন যাদব সন্ধ্যার সময় শঙ্করের খোঁজে গিয়াছিল, সে কথা রাধাচরণ জানেন; যাদব চলিয়া গেলে বারাণ্ডায় বসিয়া তিনি মৃতা স্ত্রীর সম্পর্কে যে-সব কথা বলিয়াছিলেন, তাহা সহ্য করা যে-কোন সন্তানের পক্ষে দুঃসহ।

ইহার পর তিনি ব্রজনাথকে শাসাইয়া ছিলেন—কৃষ্ণাকে এখানে তিনি একা রাখিতে পারেন না, যুবতী কন্যাকে অরক্ষিত অবস্থায় রাখা মোটেই উচিত নয়, এ সম্পর্কে তিনি কতকগুলা সংস্কৃত শ্লোকও আবৃত্তি করিয়াছিলেন। স্পষ্টই বলিয়াছিলেন—কমলা নিজে অধঃপাতে

গিয়াছিল, কন্যাকে পর্য্যন্ত সেই পথে বসাইয়া গিয়াছে। ওই যে শঙ্কর ছোকরার সঙ্গে এতটা মাখামাখি, ইহার অর্থ কি?

কৃষ্ণার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ চমকাইয়া গিয়াছিল, সে একবার রুক্ষকণ্ঠে কি বলিতে গিয়া থামিয়া গিয়াছিল—।

না, এখানে সে কোন কথা বলিবে না—; এরূপ কটুক্তি সে কখনই সহ্য করিবে না—নিশ্চয়ই না।

যাত্রার মুহূর্ত্ত যায়, বাক্সটা গাড়ীতে উঠিয়াছে, কৃষ্ণা বাহির হয় না,—রাধাচরণ উত্যক্ত হইয়া উঠিলেন। একি রে বাবা, লেখাপড়া যথেষ্ট শিখিয়াছে, সময়ের কোন জ্ঞান নাই? তাহাকে রুক্ষভাবে কোন কথা বলিবারও যো নাই, যদি বিগড়াইয়া যায় তাঁহার সব উদ্দেশ্য পণ্ড হইয়া যাইবে।

ব্যস্তভাবে ভিতরে আসিয়া দেখিলেন কৃষ্ণা চুপ করিয়া বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া আছে।

রুক্ষ কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব মোলায়েম করিয়া রাধাচরণ বলিলেন, "অনর্থক দেরী হয়ে যাচ্ছে কৃষ্ণা, আবার ওদিকে ট্রেন ধরতে হবে তো। এই ট্রেনে গেলে শিয়ালদয় ওদিককার ট্রেন ধরতে পারব, তবে যাওয়া যাবে, নচেৎ শিয়ালদয় গিয়ে কতক্ষণ বসে থাকতে হবে কে জানে।"

কৃষ্ণা উত্তর দিল, "শিয়ালদর ট্রেন টাইম আমি দেখেছি, এখানকার সময়ও আমার জানা আছে, অনর্থক ষ্টেশনে গিয়ে একঘণ্টা বসে থাকবার কোন দরকার নেই।"

রাধাচরণ তিক্তকণ্ঠে বলিলেন, "এদিকে যাত্রার সময় যে চলে যায়, দিনক্ষণ সময় দেখে বাড়ী হতে বার হওয়া উচিত।"

স্থির ভাবে কৃষ্ণা বলিল, "দিনক্ষণ, সময় দেখে বার হলেই যে সব ভালো হয় তার কোন মানে নেই। আপনি বরং এই সময় যাত্রা করে বাড়ীর বাইরে গিয়ে দাঁড়ান, আমি ঠিক সময়ে বার হচ্ছি।"

রাধাচরণ মুহূর্ত্ত মাত্র তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিলেন, ভিতরে ভিতরে বাষ্প যে অনেকখানি জমিয়া ছিল তাহা তাঁহার মুখ দেখিয়া বেশ বুঝা যায়, কিন্তু তিনি সে বাষ্প বাহির হইতে দিলেন না, একেবারে চাপিয়া গেলেন। শুষ্ক এক টুকরা হাসি মুখের উপর ফুটাইয়া বলিলেন, "আহা, উল্টো বোঝ কেন মা, আমার জন্যে আমি বলছিনে, আমি তোমার জন্যেই বলছি। তুমি যাচ্ছো একটা নতূন জায়গায়, হিঁদুর মেয়ে—দিনক্ষণ দেখে যাত্রা করা দরকার তোমারই তো।"

কৃষ্ণা মাথা নাড়িল, "কিন্তু আপনি গোড়ায় ভুল করছেন, কারণ আমি হিন্দুর মেয়ে হলেও আমার মামা বাবু এত ছোট গণ্ডীর মধ্যে রেখে আমায় মানুষ করেননি; এত বাধা নিষেধ, মঙ্গল অমঙ্গলের বার্ত্তাও কোনদিন শুনান নি—।"

রুষ্ট হইয়া রাধাচরণ বলিলেন, "তা শিখাবেন কেন—আমি জানি সে সব, তোমার অনেক আগে তোমার মামাবাবুকে আমি বিলক্ষণ চিনেছি। তোমার মামাবাবু কোন ধর্ম্মের লোকই নন,—না হিন্দু, না মুসলমান, না খৃশ্চান,—এ রকম ভাবে জীবন কাটানোর চেয়ে যে কোন একটা ধর্ম্ম নিলে তিনিও যথেষ্ট শান্তি পেতেন, আর সকলেও নিশ্চিন্ত হতো। এই—না হিন্দু, না মুসলমান, না খৃশ্চান

থাকার জন্যে তিনি নিজে তো গেছেনই, গরীব ভশ্চায আমাকে পর্য্যন্ত জড়িয়ে নিয়ে আমার জীবনটাকেও বিষময় করে তুলেছেন।”

কথাটার মধ্যে আক্ষেপ ছিল যথেষ্ট—অন্ততঃ পক্ষে তিনি মনে করেন, তিনি যে স্ত্রী কন্যা লইয়া সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন নাই, এ কেবল ব্রজনাথের শিক্ষার ফল। ক্ষণকাল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়াও তিনি কৃষ্ণার নড়িবার কোন উদ্যোগ দেখিতে পাইলেন না, বিরক্ত হইয়া তিনি বলিলেন, “কি—তুমি যাবে কি যাবে না—সেই কথাটা আমায় স্পষ্ট বলে দাও। আগে বললেই হতো তুমি যাবে না, তা হলে আমাকে আমার সব কাজের ক্ষতি করে এখানে এমন করে বসে থাকতে হতো না।”

তিনি ভিতরে ভিতরে বিলক্ষণ রুষ্ট হইয়াছেন তাহা বুঝিয়াও সংযত কণ্ঠে কৃষ্ণা বলিল, “যাব বলে যখন ঠিক করেছি তা আর রদ হতে পারে না। আপনি শান্ত হয়ে বাইরে আর পাঁচ সাত মিনিট অপেক্ষা করুন, এর মধ্যেই শঙ্করদা এসে পড়বে এখন।”

“শঙ্কর দা—”

রাধাচরণ মুখ বিকৃত করিলেন, “শঙ্কর দা এসে কি করবে,—সে অনুমতি না দিলে তোমার যাওয়া হতে পারবে না?”

কৃষ্ণা বুঝিতেছিল—বিসুভিয়সের ভিতরে গলিত ধাতু টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতেছে, যে কোন মুহূর্ত্তে, যে কোন আকারে বাহির হইয়া পড়িতে পারে; সে একটু হাসিয়া বলিল, “তা নয়, তবু মামাবাবু ওঁকেই বলে গেছেন কি-না, যাওয়ার সময়টায় একবার বলে যাওয়া উচিত, সেটা হবে ভদ্রতা।”

"ভদ্রতা –"

ক্রোধের আতিশয্যে রাধাচরণের মুখ দিয়া আর কোন কথা বাহির হয় না, পাছে আত্মসম্বরণ করিতে না পারেন, এই ভয়ে তিনি বাহিরে চলিয়া গেলেন।

বেলা নয়টায় ট্রেন, কিন্তু কয়টা যে বাজিয়াছে তাহা বুঝিবার উপায় নাই।

এমন বাড়ী—একটা ঘড়ি পর্য্যন্ত যাহা ছিল তাহাও নাই, কৃষ্ণা সে ঘড়ি শঙ্করের মার কাছে পাঠাইয়া দিয়াছে। যাক গিয়ে, পরের ঘড়ি রাখিয়া কোন ফল নাই, শেষ কালে জবাব দীহি করিতে প্রাণান্ত হইবে। আজ আকাশটাও যেন মুখ ঢাকিয়া আছে, এতটুকুর জন্য একটীবারও সূর্য্যের মুখ দেখা যায় নাই। যে রকম কালো মেঘ সারা আকাশ ছড়িয়া আসিয়াছে, বেশ বুঝা যাইতেছে, এই বাতাসটুকু বন্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি নামিয়া আসিবে; অনর্থক জলে ভেজা আজ অদৃষ্টে আছে, তাহাতে এতটুকু ভুল নাই।

যাদব শঙ্করকে খবর দিয়া আসিয়াছিল, শঙ্কর তাড়াতাড়ি করিয়া আসিল।

কৃষ্ণা তখনও সেইখানেই দাঁড়াইয়া—

হাসিমুখে শঙ্কর বলিল, "চলছো নাকি কৃষ্ণা, একেবারে অজ্ঞাত বাসে যাত্রা,—বেশ বেশ; ভারি খুসি হয়েছি। আমি সেদিন পর্য্যন্ত কিছু জানি নি, এই মাত্র যাদবের মুখে শুনলুম তুমি নাকি নিজের ইচ্ছাতেই অজ্ঞাতবাসে চলেছো, তার মানে?"

কৃষ্ণা বলিল, "মানে যথেষ্ট আছে বই কি, কিন্তু অত বিশদভাবে

বুঝতে গেলে ট্রেণের সময় থাকবে না শঙ্কর দা,—যদি পারি, পরে কোনদিন তোমায় জানাব। আজ তোমায় শুধু যাওয়ার বেলায় একটা কথা বলে যাই—যাদবদা রইলো, মামার বাড়ীঘর জিনিসপত্র সব রইলো, তোমরা দেখো।"

চিন্তিত মুখে শঙ্কর বলিল, "এইখানেই ভারি ভাবনায় ফেললে কৃষ্ণা, কারণ আমার সঙ্গে দেশের প্রায় সম্পর্ক নেই বললেই চলে,—তা তো তুমিও জানো। সেই যেদিন মাসীমার শ্রাদ্ধ হল, সেই রাত্রেই আমাকে চলে যেতে হয়েছিল এলাহাবাদে, ফিরেছি সবে কাল রাত্রে, আবার হয়তো কালই যেতে হবে মুঙ্গেরে, কি গৌহাটীতে, কিম্বা লক্ষ্ণৌ অথবা দিল্লী,—জানো তো—বাড়ী আমার থাকার যো নেই—" বলিতে বলিতে সে হাসিল, "অর্থাৎ আমি যে কোনকালে একটা জায়গায় টিঁকে থাকতে পারিনে তাওতো তুমি জানো কৃষ্ণা, আমায় যেন ভূতে চাবুক মেরে বার করে, কাজেই কি করে সব দেখাশোনার ভার নেই বল দেখি। দেশের সেবা ব্রত নিয়েছি—সে ব্রত পালন করা চাই তো।"

কৃষ্ণা চুপ করিয়া রহিল,—

তাহার পর বলিল, "তবু যখন আসবে দেখাশোনা ক'রো। মামা বাবুকে আমি সব জানিয়ে গেছি, তুমিও দয়া করে একখানা পত্র লিখে সব জানিয়ে দিয়ো শঙ্করদা। মামাবাবুর ব্যবসা নাকি ফেল পড়েছে, তবু তিনি এখনও প্রাণপণে তাকে টেনে তুলবার যোগাড় করছেন, যদি ফল না পাওয়া যায়, লিখেছেন শিগ্‌গীরই তিনি দেশে ফিরবেন। আমি তাঁকে চিনি শঙ্করদা, তিনি ভেঙ্গে পড়বার লোক

নন, যেমন করেই হোক আবার দাঁড়াবেন—তাঁর মনে সে সাহস আছে, শক্তি আছে। তবু যখন তিনি ফিরবেন—"

তাহার কণ্ঠস্বর হঠাৎ রুদ্ধ হইয়া গেল, সে অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

বাহির হইতে রাধাচরণ হাঁক দিলেন, "কথাবার্ত্তা হ'ল যাদব, না গাড়ি ফিরিয়ে দেব ?"

কৃষ্ণা সচকিত হইয়া উঠিল, "ওই যাঃ, ওঁর হুঁকো কলকেটা সঙ্গে দাওনি যাদবদা, খানিকটা তামাক টিকেও দিয়ে দাও।"

তাহার পর শঙ্করকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "আমি যাচ্ছি শঙ্করদা, জানিনে আর কখনও তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে কিনা—।"

বলিতে বলিতে সে জীবনে এই প্রথম শঙ্করের পায়ের উপর নত হইয়া প্রণাম করিল—।

শঙ্কর হঠাৎ যেন চমকাইয়া উঠিল, মনে হইল যেন দুই ফোঁটা গরম জল তাহার পায়ের উপর ঝরিয়া পড়িল, কৃষ্ণা উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "আচ্ছা, চললুম শঙ্করদা,—অনেকদিন অনেক রকমে তোমায় জ্বালিয়েছি, কিছু মনে করো না।"

সে বাহির হইল—।

গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল, রাধাচরণ অস্থির ভাবে পাদচারণা করিতেছিলেন, কৃষ্ণা নির্ব্বাকে গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

রাধাচরণ গাড়ীতে উঠিলেন না, সঙ্গে সঙ্গে পদব্রজে চলিলেন। যাইবার সময় যাদবকে বলিয়া গেলেন—বাবু যদি আসেন, তাঁহাকে যেন সে একবার চৌগাছায় যাইবার কথা বলে।

যাদব চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ফিরিল।

সঙ্গে সঙ্গে চলিতে চলিতে শঙ্কর বলিল, "কৃষ্ণা যে হঠাৎ চলে যাবে, তা তো আগে জানি নি যাদব।"

যাদব উত্তর দিল, "দিদিমণি তো জোর করেই চলে গেলেন দাদাবাবু।"

উৎসুক হইয়া শঙ্কর বলিল, "জোর করে গেলেন কেন?"

যাদব বলিল, "সে অনেক কথা দাদাবাবু।"

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, "অনেক কথাটা কি,—সেটা সংক্ষেপে বললেও ত চলে। বলতে যদি নেহাৎ আপত্তি না থাকে তা হলে বলে ফেলাই ভালো। মামাবাবু আমাদের দেখাশোনা করার ভার দিয়েছিলেন বলেই জিজ্ঞাসা করছি, নচেৎ জিজ্ঞাসা করার কোন দরকারও ছিল না।"

যাদব ফিরিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "যতদিন মা ছিলেন ততদিন যা কিছু ঝড়-ঝাপটা তাঁর ওপর দিয়েই বয়ে গেছে; আজ যদি আমার বাবুও এখানে থাকতেন, দিদিমণিকে এসব সইতে হতো না, বাবুর ওপর দিয়েই যা কিছু চলে যেতো। আমি একদিনকার কথা জানি দাদাবাবু, সেদিন মা নেহাৎ সহ্য করতে না পেরে মুখ ফুটে বলে ফেলেছিলেন—"

যাদব চুপ করিয়া গেল।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলেছিলেন?"

যাদব একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস টানিয়া লইয়া বলিল, "সে অনেক কথা

দাদাবাবু, তাঁর গত জীবনের মস্ত বড় ইতিহাস। কৃষ্ণা দিদিমণিকেও ঠিক সেই কথা বলে সেদিন রাত্রে তাঁর বাবা শাসিয়েছেন, স্পষ্ট বলেছেন তার মনে কোন খারাপ অভিপ্রায় আছে, না হলে সে কেবল আমার ভরসায় এখানে থাকিতে চায় কি করে—?"

"স্কাউণ্ড্রেল—পিশাচ"।

শঙ্করের মুখ দিয়া আর কথা বাহির হয় না, সে শুধু ফুলিতেছিল।

"এ কথা একটু আগেও জানাতে যদি যাদব, আমি একবার লোকটাকে দেখে নিতুম—।"

যাদব মাথা নাড়িল, বলিল, "না, দিদিমণি তা সহ্য করতে পারতো না। যে লোক তার স্ত্রীর নামে কলঙ্ক দিয়ে একদিন গর্ভবতী স্ত্রীকে তাড়িয়েছে, সে সবই করতে পারে, মেয়ের নামেও কোন কথা বলতে তার বাধলো না,—কারণ মেয়েকে সে ভালবাসতে পারে নি।"

শঙ্কর বলিল, "তবে নিয়ে গেল কেন?"

যাদব বলিল, "একটা কোন অভিপ্রায় আছে। কিছুদিন আগে পত্র দিয়েছিলেন, দিদিমণি বড় হয়ে গেছে এখন বিয়ে দেওয়া দরকার এবং সেজন্য পাত্র যোগাড়ের চেষ্টা করা হচ্ছে। আমার মনে হয় এই রকম কোন কারণেই তিনি নাছোড় হয়ে দিদিমণিকে নিয়ে গেলেন।"

শঙ্কর ব্যগ্র হইয়া বলিল, "কিন্তু এখনও ফিরিয়ে আনা যায় যাদব, ট্রেণ আসতে এখনও একঘণ্টা দেরী।"

যাদব বিকৃতকণ্ঠে বলিল, "তা করতে যাবেন না দাদাবাবু। আপনি কৃষ্ণা দিদিকে চেনেন না, ভারি একগুঁয়ে মেয়ে, যা ধরবে তা কিছুতেই

ছাড়বে না। সে যখন জিদ ধরেছে, যাবেই, কেউ তার যাওয়া রদ করতে পাবরে না।”

শঙ্কর আর কথা বলিল না—।

৬

ক্ষুদ্র চৌগাছা গ্রাম—

লোকজন খুব বেশী বাস করে না, তবু যা আছে, গ্রামের পক্ষে তা নেহাৎ মন্দ নয়।—

সমস্ত পথ কৃষ্ণা একটীও কথা বলে নাই। মাঝের গাঁ ষ্টেশনে নামিয়া যখন গরুর গাড়ীতে উঠিতে হইল, তখন রাধাচরণও গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন।

নিশ্চিন্ত ভাবে একছিলিম তামাক সাজিয়া হুঁকা টানিতে টানিতে তিনি কৃষ্ণার গম্ভীর মুখের পানে দুই চার বার তাকাইলেন—!

মনে আঘাত লাগিয়াছে—হুঁ,—লাগিবারই কথা। মামার বাড়ীতে দিব্য আমোদ-প্রমোদে দিন কাটিতেছিল, এখানে কঠোর শাসনের মধ্যে আসিয়া কিছুই যে হইবে না, তাহা জানা কথা।

এতক্ষণে কথা বলিবার অবকাশ পাইয়া তিনি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন; হুঁকা টানিতে টানিতে বলিলেন, “তোমার মামার বাড়ী ছেড়ে আসতে বেশ কষ্ট হয়েছে তা বুঝেছি,—চিরকাল যে যেখানে থাকে

তার সে জায়গা ছাড়তে স্বভাবতঃই কষ্ট হয়ে থাকে। আমাদের বাড়ীতে থাকতে তোমার কষ্ট হবে না—তা তুমি দেখো,—অনেক মেয়েছেলে আসে, তুমি এসেছো শুনে আরও সবাই আসবে। তবে হ্যাঁ, কোন পুরুষ মানুষ আসবে না বটে, পুরুষদের আমি আসতে দেবও না।"

হুঁকাতে একটা সজোরে টান দিয়া একমুখ ধোঁয়া অল্পে অল্পে ছাড়িয়া দিতে দিতে সরোষে তিনি বলিলেন, "কেনই বা তারা বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে মিলতে আসবে? তোমার মামা যেমন—অনায়াসে যে কোন ছেলেকে বাড়ীতে আসবার অনুমতি দিয়েছে, আমার কাছে সেটি হবে না। পুরুষ ছেলের কাজ বাইরে পাঁচ জনের সঙ্গে মিশবে, কাজ কর্ম্ম করবে, মেয়েদের মত প্যানপেনে স্বভার নিয়ে তারা মিশতে আসবে কেন মেয়েদের সঙ্গে? ওই যে তোমার শঙ্করদা,—ওই ছেলেটীকে আমি মোটে পছন্দ করিনে।"

কৃষ্ণা কিছু উত্তর দিবে এই আশায় তিনি উদগ্রীব হইয়া কৃষ্ণার পানে তাকাইলেন,—কিন্তু সে একেবারেই উদাসিনীর মত রাধাচরণের বিপুল দেহের পাশ দিয়া এতটুকু ফাঁকের মধ্যে বাহিরের যে মাঠটুকু চোখে পড়িতেছিল তাহারই পানে তাকাইয়া ছিল।

মাঠের মধ্য দিয়া উঁচু নিচু পথ, বর্ষাকালে মাঠ যখন জলে ভরিয়া উঠে, তখন পথেও জল জমে প্রচুর। মাঝে মাঝে যে সব গর্ত্ত হইয়া গিয়াছে গাড়ী তাহার মধ্যে নামিতেছিল, সেই খালের মত স্থান হইতে গাড়ী টানিয়া তুলিতে গরু দুইটার বড় কম কষ্ট হইতেছিল না।

দীর্ঘ পথ—এ যেন ফুরায় না—।

রাধাচরণ একবার কি ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ক্ষিধে পেয়েছে ?"

কৃষ্ণা মাথা নাড়িল, "না—"

রাধাচরণ বাহিরের দিকে তাকাইলেন, যেন কতকটা স্বগত ভাবেই বলিলেন, "আর ক্ষিধে পেলেই বা কি হবে,—বাড়ী পৌঁছাতে প্রায় সন্ধ্যে হয়ে যাবে,—তার পর রান্না-বান্না করা—তা তো আজ ঘটে উঠবে না—মনে হয়। তোমার এক পিসীমা আছেন বটে,—দেখা যাক, যদি খাওয়া-দাওয়ার যোগাড়টা কোন রকমে হয়ে যায়। খবর তো দেইনি, ওরা জানবেই বা কি করে? যে-সব মিলিটারী মেজাজ আজকালকার ছেলে-মেয়েদের,—কথা বলতে ভয় লাগে। দিন ঠিক করে রেঁধে-বেড়ে রাখতে পত্র দেই, শেষকালে যদি বেঁকে বসে,—যাব না ;—তা বলাটাও তো বিচিত্র নয়।"

কৃষ্ণার তরফ হইতে কোন জবাব আসিল না, সে যেন মুখে সিমেণ্ট আঁটিয়াছে।

কথা বলিতে না পাইয়া রাধাচরণের মুস্কিল হয়, অবশেষে কথা আরম্ভ হইল গাড়োয়ানের সঙ্গে—তাঁহার পরিচিত গাড়োয়ান ; কাজেই তাহার সব কিছু তাঁহার জানা আছে।

মাঠের পথ ভাঙ্গিয়া গ্রামের মধ্যে যখন গাড়ী আসিয়া পৌঁছাইল তখন সন্ধ্যার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত।

পথের ধারে একটা বাড়ীর সামনে গাড়োয়ান গাড়ী নামাইল, রাধাচরণ নামিয়া পড়িলেন,—বলিলেন, "এই আমাদের বাড়ী, নেমে পড়।" গাড়োয়ানকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তুই বাক্সটা ভেতরে নিয়ে যা যুধিষ্ঠির ; আমি কৃষ্ণাকে নিয়ে যাচ্ছি।"

সামনের ঘর খানা কোঠা—ভিতরের দিককার তুখানা ঘর মাটির উপরে খড়ের ছাউনি। রাধাচরণের এক বিধবা ভগিনীর বাড়ী, তিনি পুত্র-পুত্রবধূসহ এখানেই বাস করেন। শুনা গেল রাধাচরণের বাড়ী ও-পাড়ায় ছিল, সেবার বর্ষায় জীর্ণ গৃহ পড়িয়া যাওয়ায় বিধবা ভগিনী তাঁহাকে নিজের বাড়ীতে আনিয়াছেন ও সযত্নে রাখিয়াছেন।

কৃষ্ণাকে তিনি যে সঙ্গে করিয়া আনিবেন এ কথা তাঁহারা কেহই জানিতে পারেন নাই, তাই তাহাকে দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্য হইয়া গেল—ভগিনী সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ মেয়েটী কে দাদা?"

রাধাচরণ তখন গাড়োয়ানের সাহায্যে জিনিসপত্রগুলি গাড়ী হইতে নামাইতে ব্যস্ত ছিলেন, তামাক টানিবার প্রবল তৃষ্ণা অন্তরে জাগিলেও এতটুকু ফুরসুৎ মিলিতেছিল না—ভগিনীর কথার উত্তরে কেবল মাত্র বলিলেন, "হচ্ছে—বলছি।"

কৃষ্ণা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল—।

ইহারই মধ্যে সন্ধ্যার তরল অন্ধকার আস্তে আস্তে গ্রামের বুকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল; একটী মেয়ে অপরিসর প্রাঙ্গনের একটী কোণে অবস্থিত তুলসী-তলায় প্রদীপ দিয়া প্রণাম করিয়া গেল, ঘরে সন্ধ্যা প্রদীপ দেখাইয়া শাঁখ বাজাইল।

রাধাচরণের ভগিনী বারাণ্ডায় আহ্নিক করিতে বসিলেন,—মালা জপ করিতে করিতে তাহারই এক ফাঁকে কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন, "মেয়েটাকে বসতে বল।"

কন্যা উষা কৃষ্ণাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "আসুন—"

মাতা মালা জপ করিতে করিতে মুখ বিকৃত করিলেন—অর্থাৎ আসুন কথাটা তাঁহার মনোমত নয়।

রাধাচরণ গাড়োয়ানের ভাড়া মিটাইয়া বাড়ীর ভিতরে পদার্পণ করিতে দেখিতে পাইলেন, কৃষ্ণা আবছা অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে।

বিকৃত মুখে বলিলেন, "ওখানে বসতে কি হল—ওরা ডাকছে যে।"

কৃষ্ণা দৃঢ়পদে অগ্রসর হইয়া বারাণ্ডার ধারে আসিয়া বসিল। উষা কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, "পা ঝুলিয়ে বসোনা, অন্ধকার হয়ে এসেছে, সাপ-টাপ্ বার হতে পারে।"

বারাণ্ডার অপর দিকে বসিয়া তামাক সাজিতে সাজিতে ল্যাম্পের ম্লান আলোয় কৃষ্ণার পানে অবজ্ঞাসূচক দৃষ্টিপাত করিয়া রাধাচরণ বলিলেন, "মনটা নেহাৎ খারাপ কি-না,—মামার বাড়ী ছেড়ে আসতে হয়েছে তো—"

ভগিনী তাড়াতাড়ি জপ সারিয়া লইয়া মালাটা হরিনামের ঝুলির মধ্যে রাখিয়া প্রণামপর্ব্বটা সারিয়া লইলেন। এতক্ষণে তাঁহার আবার প্রশ্ন করিবার সুযোগ হইল, বলিলেন, "এই কি তোমার মেয়ে নাকি দাদা—ওমা, তা আগে বলতে হয়—? কই দেখি—"

ল্যাম্পটা হাতে লইয়া কৃষ্ণার নিকটস্থ হইয়া তিনি তাহার নত মুখখানা তুলিয়া ধরিলেন। ল্যাম্পের আলো দৃপ্তভাবে কৃষ্ণার মুখের উপর ছড়াইয়া পড়িল, সে মুখের পানে দৃষ্টিপাত করিয়া ভগিনী স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

খানিকক্ষণ নিস্তব্ধে তাহার পানে তাকাইয়া থাকিয়া একটা দীর্ঘ

নিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি একবার চোখ তুলিয়া নিজের কন্যার পানে তাকাইলেন,—হাতের আলোটা নামাইয়া রাখিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, তোমার মেয়ে সুন্দরী বটে দাদা, এ মেয়ের বিয়ে দিতে তোমার বেশী কিছু বেগ পেঁতে হবে না। বেশীই বা বলছি কেন মোটেই বেগ পেতে হবে না, উল্টে তোমারই একটা হিল্লে হয়ে যাবে দেখো।"

তামাক টানিতে টানিতে রাধাচরণ বলিলেন, "সেইজন্যেই তো একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে এলুম। পেলুম না তো কিছুই—একটা পয়সা পর্য্যন্ত নয়;—দেখছো না, গায়ে একটা সোনার আঁচড় পর্য্যন্ত নেই,—দু' হাতে কেবল কাঁচের চুড়ি। ভাবলুম—তবু ওকেই নিয়ে যাই, অন্যদিক দিয়েও যদি কিছু সুরাহা করতে পারা যায়।"

ভগিনী সৌরভী আবার একটা নিঃশ্বাস ফেলিলেন—।

৭

দিন চলিতে আরম্ভ করে।

কৃষ্ণার দিন সোনারপুরেও কাটিয়াছিল—এখানেও কাটিতেছে।—

পিসীমা—তাঁহার পুত্র কন্যা সকলেরই সহিত পরিচয় হইয়া গেল।

পুত্র মোহিত গ্রামেই জমিদারী কাছারীতে কাজ করে—বেতন সামান্য হইলেও অন্যদিক দিয়া আয় ছিল নেহাৎ কম নয়। ধরিতে গেলে ইহাতেই সংসার চলিয়া যাইত। পুত্রবধূ প্রমীলা নেহাৎ পল্লী-গ্রামের মেয়ে ও বধূ,—কন্যা উষা আজও অবিবাহিতা।

সোনারপুরের আবহাওয়া হইতে এখানকার আবহাওয়া একেবারে ভিন্ন। কাছাকাছি কলিকাতা থাকায় ছেলে মেয়েদের পড়াশুনার চর্চ্চা সোনারপুর হইতে অবাধে চলিত,—মেয়েদের স্বাধীনতায় সেখানে কেহই বাধা দেয় নাই। কলিকাতার পাশাপাশি গ্রামসমূহ দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে একেবারে ভিন্ন, সে জন্য সেখানে থাকিতে কৃষ্ণা প্রতিদিন কলিকাতায় গিয়াছে, বেথুনে ক্লাস করিয়া সন্ধ্যার ট্রেণে বাড়ী ফিরিয়াছে, যাদব ষ্টেশন হইতে তাহাকে বাড়ী লইয়া গিয়াছে।

এখানে কৃষ্ণা প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিল—যাহাই হোক না, সে সবই সহ্য করিবে বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। সোনারপুরে থাকিতে সে নিজের পড়াশুনা লইয়া দিন কাটাইত, কাহারও সহিত মেলামেশা করার অবকাশ তাহার ছিল না। সংসার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞা কৃষ্ণার

এখানে আসিয়া সেদিক দিয়া প্রচুর অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছিল। পাড়ার কেবল নয়, গ্রামের মেয়েরা পর্য্যন্ত দলে দলে তাহাকে দেখিতে আসিতেন, তাহার সামনেই অকুণ্ঠভাবে তাহার সমালোচনা করিতেন, কৃষ্ণা নির্ব্বিকার চিত্তে সবই সহিয়া যাইত।

রাধাচরণ ইহারই মধ্যে খানিকটা গর্ব্ব—খানিকটা অবজ্ঞার সহিত গ্রামে রাষ্ট্র করিয়াছেন—তাঁহার লেখা পড়া জানা মেয়ে—ম্যাট্রিক পাস করিয়া আই-এ, পড়িতেছে।

পাড়ার হরেকৃষ্ণ বোস বিস্ফারিত চোখে বলিলেন, "সেকি রাধু, তোমার মেয়ে অতখানি লেখাপড়া করেছে, তুমি যে বড় করতে দিলে?"

স-দুঃখে রাধাচরণ উত্তর দিলেন, "তবে আর বলছি কি দাদা, আমি জানলে কি হতো? মেয়ে মানুষের লেখা পড়া শেখা অনর্থের হেতু বইতো নয়।"

হরেকৃষ্ণ বলিলেন, "যা বলেছো। লেখাপড়া জানলে ওরা আর কাউকে মানতে চাইবে—না মানবে? সংসার উচ্ছন্ন দেবে—পরকে জ্বালাবে, নিজের ঘর জ্বালাবে। এই দেখনা—পুরাণে যে সব লেখাপড়া জানা মেয়ের নাম আছে, তাদের কি উন্নতিটা হয়েছে? বরং তারা যে সংসারে গেছে, সেই সংসার জ্বালিয়েছে—নিজেরাও জ্বলেছে; সীতা, সতী, সাবিত্রী, দময়ন্তী—কাকে ছেড়ে কাকে ধরবে বল—।"

রাধাচরণ বলিতে গেলেন, কিন্তু গান্ধারী, কুন্তি—

হরেকৃষ্ণ বাধা দিলেন, "আরে ছ্যাঃ ছ্যাঃ, তারাই কি সুখী হয়েছে মনে কর? এক একটা সংসার জ্বালিয়েছে, নিজেরাও জ্বলে পুড়ে মরেছে। আসল কথা লেখা পড়াটা মেয়ে মানুষের পক্ষে মহাপাপ;

কি দরকার ওদের লেখাপড়া শিখে—যাদের কাজ শুধু রাঁধা-বাড়া, ছেলেপুলে মানুষ করা—? যার যা কাজ তাকে তাই করতে দাও, বেশী বাড়াবাড়ি কারোই ভালো নয়।”

হরেকৃষ্ণ বোসের ভ্রাতুষ্পুত্র সুনীল চারদিন মাত্র জ্যেঠার বাড়ী আসিয়াছে। বরাবর সে কলিকাতায় থাকে—জ্যেঠামহাশয়ের সঙ্গে এতকাল কোন সম্পর্কই তাহার ছিল না। কোন খোঁজ খবর না দিয়া হঠাৎ আসিয়া পড়িলেও তাহার খাতির যত্নের অভাব হয় নাই, শিক্ষিত ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রশংসায় হরেকৃষ্ণ পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছেন, লোকের কাছে তিনি বর্ণনায় মুখর।

সে-যে কখন আসিয়া পিছনে দাঁড়াইয়াছিল, তিনি তাহা জানিতে পারেন নাই। জ্যেঠামণির সমালোচনায় সে-যে বিশেষ খুসি হয় নাই, তাহা তাহার মুখ দেখিয়া বেশ বুঝা গেল।—

সুনীল একটু হাসিয়া বলিল, “মেয়েরা তা হলে শুধু রাঁধা-বাড়া আর ছেলে মানুষই করবে জ্যাঠামশাই, এ ছাড়া জগতের আর কোন কাজ তারা করবে না ?”

পিছন ফিরিয়া তাহাকে দেখিয়া জ্যেঠামহাশয় বিশেষ খুসি হইতে পারিলেন না। আজ চারদিন সে আসিয়াছে, এই চারদিনে তাহার পরিচয় পাইয়া তিনি প্রকাশ্যে নয়,—মনে মনে শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। সে চলিয়া গেলেই তিনি বাঁচেন অথচ মুখে কিছু বলিবার যো নাই। আইনানুসারে না হোক—ধর্ম্মানুসারে এ-বাড়ীতে তাহার অর্দ্ধেক অধিকার আছে,—নাবালকের সম্পত্তি সম্পূর্ণ ভাবে হস্তগত করিতে চব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার বাধে নাই। এই চব্বিশ বৎসরের মধ্যে

শেষ কয়টা বৎসর যেন তাঁহার মধ্যে একটু দুর্ব্বলতা দেখা গিয়াছে, এবং সেটা সুনীল আসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেই বুঝিতে পারিয়াছেন।

সুনীল মাতুলালয়ে মানুষ হইয়াছে, লেখাপড়া শিখিয়াছে—আবার পড়িতে পড়িতে ছাড়িয়াও দিয়াছে। মা বর্ত্তমান নাই, মাত্র এক বৎসর হইল তিনি মারা গিয়াছেন।

সুনীল যেন একটা ঝড়—মহামারী, বিভীষিকা। বাড়ীতে আসার সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের মতবাদ জোরের সঙ্গে প্রকাশ করিয়াছে। তাহার তর্কের কাছে কুটবুদ্ধি হরেকৃষ্ণ বোস পর্য্যন্ত দাঁড়াইতে পারেন নাই।

সুনীলের কথা শুনিয়া তিনি উত্তর দিলেন, "কোনকালে মেয়েরা কি বড় আর ভালো কাজ করেছে শুনি? এ পর্য্যন্ত যা কিছু কাজ হয়েছে—পুরুষই করেছে—পুরাণে শাস্ত্রে তার ঢের নজির আছে।"

সুনীল শান্ত কণ্ঠে বলিল, "পুরাণ আর শাস্ত্র সব জড়িয়ে গড়ে উঠেছে যে ইতিহাস, তাকে তো মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিতে পারবেন না জ্যেঠামশাই। আপনার পুরাণকারেরা কত মিথ্যার সাহায্য নিয়ে চলেছেন, একটা সত্যের সঙ্গে পাঁচটা মিথ্যে মিশিয়ে সব সত্য বলে চালানোর চেষ্টা করেছেন। সে চেষ্টা সফলতা লাভ করেছিল আর এখনও করছে, আপনাদের মত যাদের পৌরাণিক মতবাদ আছে তাদের কাছে—আমাদের কাছে নয়। আপনাদের শাস্ত্রও ঠিক তেমনি,—পুরুষের হাতে সৃষ্ট বলেই তাঁরা নিজেদের মায়ের জাতিকে ধরতে গেলে একেবারে বাদ দিয়েছেন।"

রুক্ষকণ্ঠে হরেকৃষ্ণ বলিলেন, "বাদ দিয়েছেন কই,—সামাজিক জীবনে মেয়েদের কাজ—"

৮

শূন্য ঘরে একা যাদব—

দিন যেন তাহার কাটে না। সমস্ত দিন সে বাড়ীর কাজ করে, বাগানের কাজ করে। বিশেষ করিয়া এই বাগানটীই তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

কোনের স্থলপদ্ম ফুলের গাছটায় অসংখ্য কুঁড়ি ধরিয়াছে, দুই একটী ফুল পাপড়ি মেলিবার উদ্যোগ করিতেছে, যাদব অন্যমনস্ক ভাবে সেই দিকে তাকাইয়া থাকে।

কৃষ্ণার হাতের গাছ।

কয়েক বৎসর আগে শঙ্কর এতটুকু গাছটী কৃষ্ণাকে দিয়াছিল, কৃষ্ণা সযত্নে সেই গাছ লাগাইয়াছে, আজ গাছে কুঁড়ি ধরিয়াছে, ফুল ফুটিবে, কিন্তু কৃষ্ণা দেখিল না।

চাহিয়া থাকিতে থাকিতে যাদবের চোখে জল আসে, সে মাটিমাখা হাত দুখানা উল্টাইয়া চোখ মুছে।

ব্রজনাথের পত্র আসিয়াছে।

যাদবের নামের পত্র,—পত্র সে পড়িতে পারে না, হাতের লেখা দেখিয়া চিনিতে পারে। সেই পত্র লইয়া সে তখনই শঙ্করের সন্ধানে গিয়াছিল, শঙ্কর তখন বাড়ী ছিলনা,—দূর গ্রামে কোথায় গিয়াছিল।

শঙ্কর আসিলে তাহাকে একবার খবর দিবার কথা বার বার বলিয়া দিয়া যাদব ফিরিয়াছে।

শঙ্কর বাড়ী ফিরিয়া খবর পাইয়া নিজেই আসিল, "কই, কার পত্র এসেছে দেখি যাদব।"

যাদব তাড়াতাড়ি পত্র আনিয়া দিল।

শঙ্কর পত্র পড়িল—

ব্রজনাথ শীঘ্রই আসিতেছেন—বার্ম্মার ব্যবসা তিনি তুলিয়া দিয়াছেন, এবার বাড়ীতেই থাকিবেন। কৃষ্ণা দু'চার দিনের জন্য গেলেও, তিনি গিয়া তাহাকে লইয়া আসিবেন।

যাদব একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আমার ভয় হচ্ছে দাদাবাবু, ওই বুড়ো যদি এর মধ্যেই দিদির বিয়ে দিয়ে ফেলে। ওর কথাবার্ত্তা যা শুনলুম তাতে মনে হয় বিয়ের সব ঠিকঠাক করেই এখানে দিদিকে নিতে এসেছিল।"

কথাটা শঙ্করের মনে লাগে—

তবু সে বলিল, "কৃষ্ণা এমন ছেলেমানুষ নয়, তা ছাড়া লেখাপড়াও শিখেছে—এটুকু জ্ঞান তার আছে যে, তার বাবা যার তার হাতে তাকে দিতে গেলে সে বাধাটাও দেবে।"

যাদব হাসিল, বলিল, "তুমি তাকে চেনো না দাদাবাবু, সে বড় এক রোখা মেয়ে—বিশেষ তার বাপের মুখে ওই সব যা তা কথা শুনে সে জিদ ধরেছে সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে—সে যে সতী মায়ের মেয়ে তার প্রমাণ দেবে। তার অদৃষ্টে যাই হোক সে সব মেনে নেবে, একটি কথা বলবে না, তা আমি জানি।"

।প

মাত্র নীরব থাকিয়া সে আবার বলিল—

র্ত্তির জন্যে সে আ-জীবনের দুঃখ বরণ করবে, তিলে তিলে মরবে,

চেয়ে একেবারেই মরা যে ভালো ছিল দাদাবাবু।"

"তা বটে—"

সংসার অনভিজ্ঞ শঙ্কর, আজও সে কৃষ্ণার পরিচয় পায় নাই। গ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতায় যখন সে পড়িতে গিয়াছিল, মনে পড়ে কৃষ্ণা কি রকম কাঁদিয়াছিল, কৃষ্ণার কান্না দেখিয়া তাহার কান্না আসিয়াছিল। কিন্তু কলিকাতায় গিয়া নূতন আবেষ্টনীর মধ্যে পড়িয়া সে দিনকার কথা সে দুদিনে ভুলিয়া গেল, নূতন কর্ম্ম প্রবাহে সে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

চিরদিন দেশের বুকে থাকিয়াও সে দেশকে চিনে নাই—দেশের বাহিরে গিয়া সে দেশকে চিনিল, দেশের সেবা করিবে প্রতিজ্ঞা করিল এবং দেশসেবা ব্রত গ্রহণ করিল।

পিতা রাগ করিলেন—পুত্রের খরচ বন্ধ করিলেন—আদেশ দিলেন সে আর বাড়ীতে আসিতে পাইবে না।

বি-এ, একজামিনের আগে শঙ্কর ভারত-রক্ষা আইনের প্যাঁচে পড়িয়া অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য জেলে গিয়াছিল। পিতা গভর্ণমেণ্টের উচ্চপদস্থ অফিসার, পুলিসের কর্ত্তা,—সোজা কথায় এস-পি—নিজের চাকরী বজায় রাখিতে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে পুত্রের সম্পর্ক ত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

শঙ্কর জেলে বসিয়া পরীক্ষা দিল এবং সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া এম-এ. ক্লাসের পড়ার বই যোগাড় করিয়া লইল।

সাত মাস পরে সে জেল হইতে বাহির হইল কিন্তু মাকে দেখার অধিকার তাহার রহিল না।

মা-ও অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন—। স্বামীর অজ্ঞাতে গোপনে তিনি পুত্রকে ডাকিতেন, শঙ্করও সময় সুযোগ বুঝিয়া মাকে দেখিয়া যাইত। কর্ম্মস্থলে থাকিয়া পিতা কিছুই জানিতে পারেন নাই।

এই জন্যই শঙ্কর গ্রামে থাকিতে পারে নাই—কদাচিত কখন আসিয়া কখন চলিয়া যাইত সে খবর গ্রামের আর কেহ না জানিলেও জানিত শঙ্কর ও কৃষ্ণা।

এই ভাবেই তাহার দিন কাটিতেছে।

সম্প্রতি পিতার কানে এ কথা পৌঁছাইয়াছে এবং তিনি এই সপ্তাহের মধ্যেই তিনমাসের ছুটি লইয়া বাড়ী আসিতেছেন এসংবাদ শঙ্কর পাইয়াছে। অসুস্থ হওয়ায় সে কয়েকদিন বাড়ীতেই আছে, মা তাহাকে এ কয়দিন যাইতে দেন নাই। এবার তাহাকে যাইতেই হইবে। পিতাকে সে ভয় করে—পিতাকে এড়াইয়া সে আজ চার বৎসর তফাতে আছে।

পিতার উচ্চাকাঙ্খা সে জানে—এই জন্যই সে পিতাকে ভালবাসিলেও শ্রদ্ধা-ভক্তি তাহাতে ছিল না। পিতা ভীষণ রাজভক্ত, রাজার বিরুদ্ধে কোন কথা শুনিলে তাঁহার রক্ত গরম হইয়া যায়।

একদিনকার কথা শঙ্করের মনে পড়ে—

পিতা রংপুর জেলায় বদলী হইয়া গিয়াছেন—পত্নী পুত্রও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন।

দেশে স্বদেশ প্রেমের স্রোত বহিয়াছে। চারিদিকে বন্দে-মাতরম্

বাদ শব্দ। এখানে অল্পদিন আসিয়াই রমেশ বাবু এখান-কের কাছে বিভীষিকা হইয়া উঠিলেন।

একদিনকার কথা—যে দিন রমেশ বাবু নিজের হাতে একটী মেয়েকে বেত্রাঘাত করিয়া ছিলেন,—অপরাধ সে তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া তাহার পুত্রের মুক্তি কামনায় মায়ের কাছে ধন্না দিয়া পড়িয়াছিল;—

ক্ষুদ্র শঙ্করের বুকের রক্ত সেদিন গরম হইয়া উঠিয়া ছিল,—শক্তি থাকিলে সে বাধা দিতে পারিত, কিন্তু ক্ষুদ্র বালক সে—দূর হইতে দেখিয়া ছিল মাত্র, কাছে আসিয়া একটী কথা বলিবার সাহস সেদিন ছিল না।

সমগ্র দেশবাসীর বিভীষিকা ছিলেন রমেশ গাঙ্গুলী, কিন্তু তাঁহার অত্যাচারের বিরাট বাধা যে তাঁহার ঘরেই মাথা তুলিতেছিল—সেদিন তিনি তাহা জানিতে পারেন নাই।

মাধবী মুখ বুজিয়া থাকিতেন, কোনদিন স্বামীর কাছে কোন নালিশ জানান নাই, কোন ব্যাপার নিজে হইতে জানিতে চান নাই।

শঙ্কর মায়ের কাছে গিয়া বলিত—"মা-গো, বাবা কেন সকলের সঙ্গে এ-রকম ব্যবহার করেন, কেন লোকের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেন না, কেন লোকে বাবাকে ভালোবাসে না? তুমি আমায় ভালোভাবে চলতে, মানুষ হতে কত উপদেশ দাও, বাবাকেও কেন মানুষ করে তোল না।"

মা মলিন হাসি হাসিতেন।

কেন মা করেন না—সে উত্তর শঙ্কর পাইয়াছে বড় হইয়া, জ্ঞান

হইলে আর কোন দিন মায়ের কাছে কোন প্রশ্ন করে না[illegible]হার মনে পড়ে, মা একদিন বলিয়াছিলেন, "বড় হলে সব বুঝবি শঙ্কর, আমি কিছু বলতে পারব না, আমার কাছে কিছু জানতে চাস নে।"

বড় হইয়া শঙ্কর বুঝিয়াছে এবং বুঝিয়াছে বলিয়াই সে আস্তে আস্তে সরিয়া পড়িয়াছে।

পিতার সহিত বহুকাল সে দেখা করে নাই। মা এতকাল স্বামীর সহিত তাঁহার কর্ম্মস্থলে ফিরিয়াছেন—পুত্র জেলে গেলে তিনি সেই যে বাড়ীতে আসিয়াছেন, আর স্বামীর কর্ম্মস্থলে যান নাই।

৯

আগামী কাল রমেশ গাঙ্গুলী আসিবেন—

পুত্রকে লইয়া তিনিও বড় কম ত্যক্ত হন নাই। পুত্রের উপর অনেকটা যে আশা ভরসা ছিল, এ কথা অস্বীকার করিবার যো নাই। সম্পূর্ণ কালাপাহাড়ী ধাঁজে চলিলেও অন্তরে কোথায় এতটুকু নরম স্থান ছিল—তাহা হঠাৎ একদিন জানা গিয়াছে।

রাজভক্ত রমেশ গাঙ্গুলী—

নিজের অধ্যবসায় ও কর্ম্মশক্তির জন্যই সামান্য হেড কনেষ্টবলের পোষ্ট হইতে তিনি পুলিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়াছেন। তাঁহারই একমাত্র পুত্র, তাঁহার শিক্ষার সাহচর্য্যে মানুষ হইতে পারিল না, হইল ঘোর রাজদ্বেষী। এই পুত্রের জন্য রমেশ গাঙ্গুলীকে রাজদ্বারে কৈফিয়ৎ দিতে হইয়াছে, শেষ পর্য্যন্ত নির্দ্দয়ভাবে তাহাকে ত্যাগ করিয়াছেন—।

শঙ্কর যেদিন জেলে যায়, মাধবী সেদিন অন্নজল স্পর্শ করেন নাই, আর রমেশবাবু সেদিন ইউরোপীয়ান ক্লাবে গিয়া যথেষ্ট সুরা পান করিয়াছিলেন। বহুপূর্ব্বে কদাচিত সুরাপান করিলেও শঙ্করের জন্মের পর তিনি এ অভ্যাস ত্যাগ করিয়াছিলেন, শঙ্করের জেলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আবার সুরাপান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

স্বামীর নিকটে মাধবী আর থাকিতে পারেন নাই, রমেশবাবুও

দুঃখিনী মাতাকে কাছে রাখিতে চাহেন নাই, নিজেই [illegible]স্ত্রীকে বাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়াছেন এবং প্রায় আড়াই বৎসর তাঁহার [illegible] দেখা করেন নাই। প্রতি মাসে টাকা পাঠাইয়া তিনি ছুটি হইতেন। বাড়ীতে আত্মীয়-স্বজন সকলেই ছিলেন—ভাবনা করিবার কিছু ছিল না।

আড়াই বৎসর পরে স্বামী-স্ত্রীর সাক্ষাৎ হইবে, পৈতৃক-ভিটায় দীর্ঘ নয় বৎসর পরে তাঁহার পদার্পণ হইবে।

মাঝখানে রহিয়া গেছে দুর্ব্বিনীত পুত্র, রাজদ্রোহের অপরাধে সে অপরাধী, জেল খাটিয়া আসিয়াছে।

শঙ্কর চিন্তিত মুখে বলিল, "আর এখানে থাকা চললো না মা, এবার আমায় চলে যেতে হবে—আর আজই যাওয়া দরকার তা বুঝছো তো।"

মা পাংশুমুখে পুত্রের মুখের পানে নিষ্পলকে তাকাইয়া রহিলেন—

অভাগিনী মা—চিরদিনই এই সব মায়েরা সন্তানকে বুকের মধ্যে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিতে চায়, কোন মা তাহার সন্তানকে ছাড়িতে চায় না।

মায়ের বিবর্ণ মুখের পানে তাকাইয়া শঙ্কর তাঁহার বেদনা বুঝিতে-ছিল—; পরম স্নেহে সে মায়ের মুখের উপর উড়িয়া পড়া রুক্ষ চুলগুলা সরাইয়া দিতে দিতে কোমলকণ্ঠে বললে, "ছিঃ মা, এ-রকম অধীর চঞ্চল হলে কি চলবে? বাবা নিশ্চয়ই কোন রকমে শুনতে পেয়েছেন আমি এখানে এসে কয়দিন আছি, সেই জন্যেই লম্বা ছুটি নিয়ে অনেক দিন পরে বাড়ী আসছেন। এসে যদি আমায় এখানে দেখতে পান—

জেনো [illegible]টা কারও পক্ষেই ভালো হবে না—তোমার নয়—আমার নয়—[illegible]রও নয়।”

মা বুঝিতে পারেন না, বোবার মত নিঃশব্দে কেবল তাহার পানে তাকাইয়া থাকেন।

শঙ্কর তাঁহার চোখের মধ্যে প্রশ্ন দেখিতে পায়। সে বলিল, “আমি তোমার কাছে তোমার ছেলে—কিন্তু বাবার কাছে বিভীষিকা মা। বাবার চাকরী এক কথায় চলে যাবে, তাঁকে নির্য্যাতনও বড় কম সইতে হবে না—যদি কর্ত্তৃপক্ষ কোন রকমে জানতে পারেন আমি এখানে আছি। কাজ কি মা, বাবাকে এমনি করে লাঞ্ছিত নির্য্যাতীত ক’রে?”

মা তাহা বুঝেন। শঙ্কর দূরে থাকিত, কদাচিত এখানে আসিয়াই আবার চলিয়া যাইত, দিনে সে আসিত না। বাড়ীর লোকে পর্য্যন্ত জানিতে পারিত না শঙ্কর আসিয়াছে এবং চলিয়া গিয়াছে।

সম্প্রতি বড় বেশী রকম অসুখ হওয়ায় সে যাইতে পারে নাই। এখানে আসিয়া হঠাৎ কলেরা হয় এবং বাধ্য হইয়া তাহাকে মায়ের কাছে থাকিতে হয়। সম্পূর্ণ সুস্থ হইলেও দুর্ব্বল বলিয়া মা তাহাকে যাইতে দেন নাই।

কিন্তু আজই তাহাকে যাইতে হইবে।

শঙ্কর মাকে সান্ত্বনা দিল—“আমি আবার আসব মা, বাবার ছুটি ফুরিয়ে গেলে, তিনি চলে গেলে, আবার আমি রাত্রে করে লুকিয়ে এসে তোমায় দেখে যাব। তোমায় ফেলে আমি তো বেশী দূরে যেতে

পারব না মা, কাছাকাছিই থাকব—যাতে তোমার খবরটা আমি নিয়ত পেতে পারি।"

মা হঠাৎ তাহার হাত দুখানা দুই হাতে চাপিয়া ধরিলেন, ব্যাকুল কণ্ঠে বলিলেন, "আমায় সঙ্গে করে নিয়ে চল্ না বাবা, আমি এখানে একা থাকতে পারব না—"

হঠাৎ তাঁহার চোখ ছাপাইয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল ঝরিয়া শঙ্করের হাতের উপর পড়িল।

শঙ্কর ব্যস্ত হইয়া উঠিল—"একি, তুমি কাঁদছো মা—? ছি ছি ছোট্ট মেয়ের মত তোমার কান্না কি শোভা পায়? তুমি যে আমার মা, তুমি কাঁদলে আমি দাঁড়াই কোথায় ভাব দেখি?"

সে নিজেই মায়ের চোখ মুছাইয়া দিতে লাগিল।

রুদ্ধকণ্ঠে মা বলিলেন, "আমায় তোর সঙ্গে নিয়ে যাবি তো শঙ্কর?"

শঙ্কর হাসিল—বলিল, "আচ্ছা পাগ্‌লী মেয়ে তো তুমি, ভাবতে পারছো আমার অবস্থা, নিজেই কোথায় যাই—কি করি ঠিক করতে পাচ্ছিনে, এরপরে তোমার বোঝা কি করে বইব আমি, সেটা ভাবো; আমি ছেলে—যে কোন জায়গায় যেমন করে হোক থাকতে পারব —কিন্তু তুমি তো থাকতে পারবে না মা। পারবে তুমি কুলিবস্তীতে সত্তর আশীজন লোকের সঙ্গে একা থাকতে—পারবে কি তাদের রান্না খেতে?"

ব্যাকুল কণ্ঠে মা বলিলেন, "কিন্তু তুই তো পারিস শঙ্কর? শুনলুম কিছু দিন আগে তুই নাকি পুরীতে নুলিয়াদের মধ্যে একমাস কাটিয়ে ছিলি—"

শঙ্কর বলিল, "মিথ্যে শোননি মা—তাদের মধ্যে তাদেরই একজন হয়ে আমি একমাস নয়—তিন মাস কাটিয়েছি। এত গরীব তারা—আস্ত চাল কেনার পয়সাও তাদের জোটে না—ভাঙ্গা পোকা পড়া চাল—যাকে তোমরা ক্ষুদ বল—অল্প দামে তাই কিনে সমুদ্রের নোনা জলে সিদ্ধ করে খায়—আমিও তাই খেয়েছি। সেখান হতেই পুলিস সন্ধান পেয়ে আমায় ধরে নিয়ে এসেছিল।"

মা একমুহূর্ত্ত নীরব রহিলেন, তাহার পর আর্দ্রকণ্ঠে বলিলেন, "আমি তাই ভাবছি শঙ্কর, কত কষ্টই না সইছিস, এখনও কত সইতে হবে তাই বা কে জানে।"

চট করিয়া মায়ের পায়ের ধূলা মাথায় দিয়া শঙ্কর বলিল, "ওইটুকুই আশীর্ব্বাদ কর মা, শুধু বল আমার ব্রতপালন করতে যত দুঃখ কষ্টই আসুক—আমি যেন বিচলিত না হই। কবির ভাষায় বলতে গেলে বলব—"বিপদে আমায় রক্ষা কর, এ নহে মোর প্রার্থনা,—

বিপদে যেন করিতে পারি জয়।

তুমি কেন দুঃখ করছো মা—ব্রত পালন করতে অনেক দুঃখ কষ্ট সইতে হয় তাতো জানো? শুধু এই আশীর্ব্বাদ কর আমি যেন অটুট থাকতে পারি।"

মা পুত্রের মাথার উপর নিঃশব্দে হাতখানা রাখিলেন—নিঃশব্দে আশীর্ব্বাদ করিলেন—

দেশ সেবার পুরস্কার—যত বড় দুঃখ বেদনাই হোক সহিতে হইবে। তাঁহার শঙ্কর নন্দদুলাল হইয়া মায়ের আঁচলের তলায় লুকহিয়া থাকে নাই—ঘরের কোনকে সে তীর্থ বলিয়া ভাবে নাই, বিপদকে তুচ্ছ

করিয়া সে বাহির হইয়া আসিয়াছে পথে, পথ বাহিয়া চলিয়াছে সে, নিজের লক্ষ্য নিজেই সে স্থির করিয়া লইয়াছে—যেমন করিয়াই হোক সেই লক্ষ্যে সে পৌঁছাইবে।

মা আশীর্ব্বাদ করেন—পথের বাধা সরিয়া যাক, তাঁহার পুত্রের পথ সরল হোক—সুগম হোক।

১০

কৃষ্ণার আশীর্ব্বাদ যেদিন হইয়াছে সেইদিন অকস্মাৎ যাদব আসিয়া পৌঁছাইল।—

আগামী কাল বিবাহ—

কৃষ্ণা বিবাহের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া ছিল, সবেগে মাথা নাড়িয়াছিল—বিবাহ সে করিবে না।

পিসীমা সৌরভীদেবী কুঞ্চিত মুখে বলিলেন, "এখন আর ও-কথা বললে চলবে না বাছা,—এক যদি না আসতে, তোমার সেই দেশে থাকতে—তাতে তবু কথা হতো না। এখানে এসে এত বড় থুবড়ো মেয়ে যে ঘরে থাকবে, আমার মেয়ের বিয়ে দিতে হবে তো, তোমায় নিয়ে থাকলে তো চলবে না।"

তারপর কতকটা স্বগতোক্তি করিয়াছিলেন, "দাদা নাকি নেহাৎ নাক কান কাটা, টাকার কাছে ইজ্জতের দাম ওর কাছে কোনকালেই নেই—তাই না মেয়ে বলে তোমায় ঘরে এনেছে, আমরা হলে তোমার মুখদর্শন করা দূরে থাক—তোমার নামও করতুম না তা জানো? নিজের কথাটা ভেবে দেখো বাছা, তোমার তো সবই জানা আছে শুনেছি।"

মুহূর্ত্তে কৃষ্ণা পাথর হইয়া যায়।

নিজের জন্ম রহস্য—

হায় ভগবান সে জন্মিল কেন, জন্মিল যদি এ সব কথা শুনিবার আগে তাহার মৃত্যু হইল না কেন ?

মায়ের কলঙ্ক—কিন্তু সেকি পিতার কলঙ্ক নয় ? ওই যে লোকটা —যে কৃষ্ণার পিতা নামে পরিচিত, যে আজ অসঙ্কোচে কৃষ্ণার উপর দাবী করিয়াছে—সে কলঙ্ক কি তাহার নয় ? কৃষ্ণা আজ তাহাই ভাবে।

মায়ের মৃত্যু সময় তিনি সে কথা বলিয়াছেন—ভালো থাকিতে কোন কথা কৃষ্ণাকে তিনি বলিতে পারেন নাই।

কৃষ্ণা আর ভাবিতে পারে না, তাহার মাথার মধ্যে ঝিম ঝিম করে।

মা তাহার কলঙ্কিনী নন—তিনি নিজের মুখে শেষ সে কথা জোরের সঙ্গে বলিয়া গিয়াছেন, কৃষ্ণা সে কথা বিশ্বাস করে। পিতা তাহাকে ভয় দেখাইয়াছেন, যদি সে তাঁহার কথানুসারে না চলে—জনসমাজে তাহার মায়ের গোপন কথা প্রকাশ করিয়া তাহাকে অপদস্থ করিবেন।

কৃষ্ণার হাসি পায়—

অন্তর বিদ্রোহী হইয়া উঠে—না, সে বিবাহ করিবে না, সে এখানে থাকিবে না, মামার কাছে চলিয়া যাইবে, সে পড়িবে, মানুষ হইবে, নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইবে—সে মরিতে চায় না—বাঁচিতে চায়।

কিন্তু ইহারা তাহাকে বাঁচিতে দিল না।—

শেষটায় আশীর্ব্বাদ পর্য্যন্ত হইয়া গেল, আগামী কাল বিবাহ।—

সন্ধ্যার খানিক আগে যাদব আসিয়া পৌছাইল—

বাহির হইতেই সে হাঁক দিল—"কই গো আমার দিদিমণি কোথায়—?"

সৌরভী বারাণ্ডা হইতে বলিলেন, "কে গা—?"

"আমি যাদব, দিদিমণির মামার বাড়ীর লোক—"

আন্দাজে বুঝিয়া যাদব তাঁহাকে প্রণাম করিল।

যাদবের পরিচয় রামাচরণের নিকটে সৌরভী পাইয়াছেন, সেইজন্ত বিশেষ খুসি হইতে পারিলেন না, অপ্রসন্ন মুখে বলিলেন, "হঠাৎ—চিঠি পত্র না দিয়ে তুমি যে এসে পড়েছো? কৃষ্ণা বুঝি তোমায় চিঠি দিয়েছিল—?"

যাদব হাসিমুখে মাথা নাড়িল, "না পিসীঠাকরুণ, চিঠি পত্র পেলে কি আসতুম? আজ কয়মাস দিদিমণি এসেছে, একটা খবর পাইনি সেই জন্যেই আসা। দিদিমণি কোথায়—সাড়া পাচ্ছিনে যে।"

অপ্রসন্ন মুখে সৌরভী বলিলেন, "ঘরেই আছে—আর যাবে কোথায়?"

যাদব বারাণ্ডায় উঠিল না, সেখান হইতেই ডাকিল, "দিদিমণি, ঘরে আছ কি?"

"আছি যাদবদা, এসো ঘরে—"

যাদব ঘরে প্রবেশ করিল—

কৃষ্ণা একখানা পিঁড়ি দিল,—"বসো। যাদব বসিল না, দাঁড়াইয়া রহিল,—কৃষ্ণার পানে একবার তাকাইয়া বলিল, "বড় রোগা দেখাচ্ছে যে দিদিমণি, অসুখ-বিশুখ কিছু হয়েছিল বুঝি?"

কৃষ্ণা শুষ্ক হাসিয়া মাথা নাড়িল, "না, অসুখ আমার প্রায় হয় না। এতকাল বাদে যাদবদার আজ আমার কথা মনে পড়লো বুঝি—"

তাহার চোখে জল আসে, অতিকষ্টে সে নিজেকে সামলাইয়া লয়।

যাদব বলিল, "দোষ দেবে দিদি—তা দিতে পারো। কিন্তু সত্যি কথাই বলব—আমি চাকর বই তো নই, তোমায় একবার দেখতে হলেও এঁদের অনুমতি নিতে হবে, যদি না বলেন আমায় ফিরে যেতে হবে। সেই-সব অপমানের ভয়েই আমি আসিনি—পত্রও লিখি-নি। বাবু রেঙ্গুন হতে ফিরেছেন, ফিরেই আমায় পাঠিয়েছেন। আরও দু'দিন আগে আসার কথা ছিল, বাবুর অসুখ মত হয়েছিল কিনা, তাঁকে একটু সামলে না রেখে তো আসতে পারিনে—সে একটু থামিয়া বলিল—"যে রকম এলো-মেলো মানুষ তা তো তুমি জানো না দিদি, আমি চিরকাল দেখছি এই এক রকম—কোথায় কি পড়ে থাকে ঠিক নেই, কি খাবেন না খাবেন তারও ঠিক থাকে না। আজও সে অভ্যেস যায় নি, বেড়েছে ছাড়া একরত্তি কমে নি।"

সেই মানুষটীর কথা কৃষ্ণার মনে হয়—

মামাকে সে বহুদিন দেখে নাই—প্রায় দেড় বৎসর আগে মামা আসিয়া দিন-পনেরো ছিলেন, সেই সময় কৃষ্ণাকে তিনি কলেজে দিয়া যান। দেড় বৎসরের মধ্যে কৃষ্ণা মামাকে দেখে নাই, তিনি আজ বাড়ী আসিয়াছেন, এ সময় কৃষ্ণা সেখানে নাই।

কৃষ্ণা কতক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, "মামা বেশ ভালোই আছেন তো যাদব-দা, তাঁর ব্যবসার কি হল ?"

যাদব মুখ বিকৃত করিল, "আর ব্যবসা—সে-সব হয়ে গেছে। সেই যে তাঁর একবন্ধু কে ছিল, সেই সব শেষ করেছে—জাল জোচ্চুরি করে সব নিজের নামে করে ফেলেছে। বাবু একেবারে খালি হাতে ফিরে এসেছেন, চেহারা দেখে আর চেনার উপায় নেই। নিজের অবস্থা

বুঝেই তোমায় তিনি আটক করে নিজের কাছে রাখতে চাননি দিদি, নচেৎ তোমার বাবার এতটুকু ক্ষমতা হতো না তোমায় নিয়ে আসে। এই যাদব ঘোষ তোমায় আগলাতে বুড়ো বয়সেও লাঠি ধরতো—।”

কৃষ্ণা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “যাক, যা হওয়ার ভালোই হয়েছে। মামাকে খবর দিয়ো যাদব-দা—আমার কাল বিয়ে,—আশীর্ব্বাদ আজ হয়ে গেছে—।”

“বিয়ে—তোমার বিয়ে দিদি—হ্যাঁ, কি যে বল—”

যাদব বিশ্বাস করে না, বিশ্বাস করিবার কথাও নয়। কেহ জানিল না, শুনিল না—অথচ আগামী কাল বিবাহ হইয়া যাইবে, এও কি একটা কথা।

কৃষ্ণা হাসিল, বলিল, “হ্যাঁ, সত্যিই বিয়ে হচ্ছে যাদব-দা। আজ তুমি এলে তাই দেখা হল, আজই শেষরাত্রে এঁরা মানে—আমার বাবা আমায় নিয়ে রওনা হবেন। কোথায় বিয়ে হবে তাও জানিনে, শুনেছি খুব বড়লোকের বাড়ী—তারা আজ পুরোহিত পাঠিয়ে আশীর্ব্বাদ করেছে।”

বিস্মিত যাদব বলিল, “কিন্তু আমাদের দেশে পুরুত পাঠিয়ে আশীর্ব্বাদ করবার নিয়ম তো নেই—বাড়ীর কর্ত্তারাই তো আশীর্ব্বাদ করতে আসে—”

কৃষ্ণা বলিল, “বাড়ীর কর্ত্তার সঙ্গেই যে বিয়ে যাদব-দা, তা ছাড়া তিনি খুব বড় ধনী, নিজে আশীর্ব্বাদ করতে আসতে পারেন না—এমন কি বিয়ে করতেও তিনি এখানে আসবেন না। বাবা আমায় নিয়ে রাত তিনটের ট্রেণে সেখানে যাবেন, এ কয় মাইল গরুর গাড়ীতে

যেতে যথেষ্ট দেরী হবে, সে জন্যে এই রাত্রেই দশটা এগারোটায় আমাদের বার হতে হবে।”

যাদব রুদ্ধকণ্ঠে বিস্ফারিত নেত্রে কৃষ্ণার পানে তাকাইয়া রহিল,—তাহার পর হঠাৎ উদ্ভাসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, “তুমি বলছো কি দিদিমণি, তোমার কথা আমি কিছু বুঝতে পারছি নে। আমি এ সম্বন্ধে কার সঙ্গে কথা বলব, কে আমায় সব কথা জানাতে পারবে বল দেখি?”

ধীর কণ্ঠে কৃষ্ণা বলিল, “আমিই সব কথা জানাব যাদব, আর কেহই কোন কথা ঠিক করে বলতে পারবে না—মানে বলবে না। তুমি আগে হাত পা ধোও, একটু জল খাও, তারপর সব বলব। এতটা রাস্তা হেঁটে এসেছো, শ্রান্ত তো বড় কম হওনি—একটু জল খেয়ে নাও আগে—”

সে উঠিতে যাইতেছিল—

যাদব বাধা দিল, “না, আমি সব কথা না শুনে কিছুতেই জল খাব না দিদিমণি,—আমায় সব বল, আমি তারপর হাত পা ধোব এখন।”

কৃষ্ণা একটু হাসিল, বলিল, “ব্যাপারটা এমন কিছু ভীষণ বা জটিল নয়। সকল বাপ-মায়েই তাঁদের সন্তানের ভালোর কামনা করে থাকেন, এও ঠিক তাই। হাজার হোক আমার বাপ, আমার ভালোর জন্যে তিনি যা করবেন, তা আর কেউ পারবে না যাদব-দা। কথা এমন কিছু বেশী নয়—বলব এখন সবই, তুমি বসো ঠাণ্ডা হও—তারপরে। আজ যখন এসেছো—আজই তো ফিরবে না যাদব-দা।”

রুদ্ধকণ্ঠে যাদব বলিল, “না, আমিও আজই যাব দিদিমণি, তুমি

যে ট্রেণে ফিরবে আমিও তাতেই সোনারপুর ফিরব। আমার খাওয়ার জন্যে তোমায় এতটুকু ব্যস্ত হতে হবে না, আমি ষ্টেশনে নেমেই বেশ ফলার করেছি, আজ এখানে কিছু না খেলেও চল্‌বে।"

হয়তো সে আহার করিত, কিন্তু কৃষ্ণার বিবাহ এই কথা শুনিয়া সে এখানকার জলটুকুও খাইবে না, তাহা কৃষ্ণা বুঝিল বলিয়াই চুপ করিয়া রহিল।

১১

রাত্রি তিনটায় ট্রেণ—

চৌগাছা হইতে গাড়ী ছাড়িল রাত্রি নয়টায়।

মাঝের গ্রাম ষ্টেশান ও চৌগাছার দূরত্ব অন্ততঃ পক্ষে ছয় সাত মাইলের কম নয় বরং বেশী বলিয়াই মনে হয়। ট্রেণ ঠিক মত ধরিতে হইলে গরুর গাড়ী সকাল সকাল ছাড়িতে হয়।

গাড়ীর পিছন দিকে গুটাইয়া এতটুকু হইয়া বসিয়া রহিল কৃষ্ণা, সামনের দিকে বসিলেন রাধাচরণ। পিছনে যাদব হাঁটিয়া চলিতেছিল—রাধাচরণ তাহার কথা জানিতে পারেন নাই। যাদব আসিয়াছে এ-কথা ভগিনীর নিকট শুনিয়া পর্য্যন্ত তিনি খুসি হইতে পারেন নাই, বরং দারুণ বিরক্তিতে তাঁহার মুখখানা বিকৃত হইয়া গিয়াছে।

একবার মাত্র তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—"বাবু ফিরলেন—কত টাকা আনলেন শুনি?"

যাদব উত্তর দেয় নাই—এই লোকটার সহিত কথা বলিবার প্রবৃত্তি তাহার ছিল না। বহুদিনের পুরাতন ভৃত্য সে,—সকলের কথাই সে জানিত।

কৃষ্ণা এখানে আসা পর্য্যন্ত তাহার শান্তি ছিল না। যে লোক টাকার জন্য নিজের স্ত্রীর মর্য্যাদা পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে গিয়াছে—তাহার পর স্ত্রীর চরিত্রে কলঙ্ক দিয়া সসত্ত্বা স্ত্রীকে তাড়াইয়া দিয়াছে, কন্যার

মর্য্যাদাও তাহার কাছে অতি তুচ্ছ। বিশেষ কন্যাকে সে কোনদিনই দেখে নাই, তাহার উপর মায়া মমতা পর্য্যন্ত তাহার নাই।

ব্রজনাথকে সে পাড়ার একটি ছেলেকে দিয়া পত্র লিখাইয়া ছিল—তাহাতে বিশদ কিছু লেখা যায় নাই, সংক্ষেপে এই বিপদের আভাসই সে দিয়াছিল। ব্রজনাথ গত সপ্তাহে মাত্র আসিয়াছেন—তাঁহাকে সুস্থ করিয়া তাঁহার পত্র লইয়া যাদব কৃষ্ণাকে সোনারপুরে ফিরাইয়া লইবার জন্য আসিয়াছে।

এখানে আসিয়া কৃষ্ণার কাল বিবাহ এবং আজ আশীর্ব্বাদ হইয়া গিয়াছে শুনিয়া সে আকাশ হইতে পড়িয়াছে।

বৃদ্ধ হইলেও তাঁহার গায়ে আজও অসীম শক্তি, হয়তো একটা দাঙ্গা বাধাইয়া বসিত—, কিন্তু কৃষ্ণা বাধা দিল—। সে শান্তকণ্ঠে বলিল, "ভগবানকে বিশ্বাস কর তো যাদব-দা,—তবে জেনে রাখো এ সবই ভগবানের হাত। মা'র এখনি মরবার সময় হয়নি,—মা যদি বেঁচে থাকতেন—বাবার ক্ষমতা হতো না আমাকে এখানে আনবার। আজ তুমি ভগবানের বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারো না যাদব-দা,—যা আমার অদৃষ্টে আছে—তা ঘটবেই।"

সে সকলদিক বাঁচাইতে চায়। নিজের উপর তাহার বিতৃষ্ণা জাগিয়াছে, নিজেকে বাঁচাইবার ইচ্ছা তাহার আর নাই, তাই কোন দিক দিয়া সে নিজেকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিল না।

গাড়ীতে তাহাকে উঠাইয়া দিতে দিতে রাধাচরণ বিকৃত মুখে বলিলেন, "চিঠি লিখে যে যাদবকে আনানো হয়েছে, তা আমার অজানা নেই কৃষ্ণা। তবে যে জন্যেই আনাও, তোমার কোন চেষ্টাই সফল

হবে না—এটুকু জেনে রেখো। আজ ওই যাদবের সঙ্গে জে[illegible]রে চলে যেতে চাও—আমি সঙ্গে সঙ্গে পুলিসে খবর দেব—তোমার মামা অসদুদ্দেশ্যে আমার মেয়েকে নিয়ে গেছেন। তোমার বয়স এখনো আঠারো বছর হয়নি—কাজেই মামলাটা চলবে ভালো—, আর শেষ পর্য্যন্ত তোমার মামা আর যাদবকে যে, এই মামলার আসামী হয়ে জেলে যেতে হবে, সে কথাটা না বললেও তুমি বুঝবে।”

কৃষ্ণার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ ছুটিয়া গেল—সে একবার রাধাচরণের দিকে তাকাইল কিন্তু অন্ধকারে কিছু দেখা গেল না।

হ্যাঁ, এ লোক সবই পারে। ভগবানকে একবার জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়—এ রকম কতগুলি লোককে তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন—কত গুলি সংসার এমন ভাবে গড়িয়া ভাঙ্গিয়াছেন ?

মা গো—

কৃষ্ণার বুকের মধ্যে রোদন গুমরাইয়া উঠে—মুক্তি সে পাইতে চায়—কিন্তু এ রকমভাবে মুক্তি নয়। মুক্তির উপায় সে জানে—সে মুক্তি খুঁজিতে তাহাকে ঘর ছাড়িতে হইবে না। একটা ক্ষুদ্র স্থঁচ যদি মানুষের মৃত্যু আনিয়া দিতে পারে—মহামুক্তি দিতে পারে, তাহার মুক্তিও অসম্ভব হইবে না।

গাড়ীতে সে উঠিয়াছিল, মুহূর্ত্তে নামিয়া পড়িল—রাধাচরণের সামনে দাঁড়াইয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, “শুনুন, একটী কথা আমি বলতে চাই—আপনার ধারণা মিথ্যে, আমি যাদবদাকে পত্র দেইনি। আমি যখন স্বেচ্ছায় এখানে এসেছি, আপনার জেনে রাখা উচিত—চলে যাব বলে আসিনি।”

স্বর কোমল পর্য্যায়ে নামাইয়া রাধাচরণ বলিলেন, "তা আমিও জানি। তবু তোমায় যে অনর্থক কড়া কথা বলেছি তার জন্যে কিছু মনে করোনা মা। কোন বাপ তার সন্তানের অশুভ কামনা করে না —আমিও করিনে। আমি যে তোমার ভালো করবার জন্যেই চেষ্টা করছি—সেটা এরপর তুমি বুঝতে পারবে যখন রাজার রাণী হয়ে বসবে।"

কৃষ্ণা গাড়ীতে উঠিল, রাধাচরণও উঠিলেন—গাড়ী গ্রাম্যপথে চলিল—

তামাক খাইতে খাইতে রাধাচরণ বলিলেন, "আমি জানি তুমি রাজরাণী হবে, চিরসুখী হবে। তোমাদের সোনারপুরে গিয়ে আমি শঙ্করের কথা শুনেছিলুম, তাকে সেদিন চোখেও দেখেছিলুম। তোমার মামাবাড়ীর অনেকে আমাকে বলেছিল, যেন শঙ্করের সঙ্গে তোমার বিয়েটা দেই—কিন্তু তাই কি হতে পারে মা—বাপ হয়ে আমি তোমার এ সর্ব্বনাশ করতে পারি? হ'লই বা সে বড়লোকের ছেলে—কিন্তু তার আছে কি? জেলের কয়েদী, আজও যাকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে, বাপের ত্যাজ্য পুত্তুর যে—তার হাতে তোমায় দেব আমি—?"

কৃষ্ণা নীরবে বসিয়া ছিল, রাধাচরণ নিজেই ইচ্ছামত কথা বলিতে ছিলেন।—

কথা বলিতে বলিতে একসময় কখন তিনি চুপ করিয়া গেলেন, অনুভবে বুঝা গেল—শ্রান্ত হইয়া তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন।—

গাড়ীর ছইয়ের পিছন দিককার আবরণের মধ্যে যে এতটুকু ফাঁক

ছিল, সেই ফাঁকে তাকাইয়া কৃষ্ণা দেখিল—যাদব আসিতেছে, সে ঠিক গাড়ীর পিছনেই আছে।—অন্ধকার গাড়ীর মধ্যে দৃষ্টি না গেলেও যাদব বুঝিতেছিল, কৃষ্ণা জাগিয়া আছে।—

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যায়, রাত্রি ক্রমে বাড়িয়া উঠে। গরুর গাড়ি মাঠের পথে ধীর মন্থর গতিতে চলিয়াছে—এ যেন এমনই ভাবে অবিরাম চলিবে, কোথাও ইহার বিরামস্থল নাই।—

যাদব চলিয়াছে। সে দ্রুত হাঁটিতে পারে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে সে ষ্টেশানে পৌছাইতে পারিত, কিন্তু সে গাড়ীর সঙ্গ লইয়াছে, ধীর গতিতে সে-ও চলিয়াছে।

কৃষ্ণার চোখে তন্দ্রা নামিয়া আসে, তন্দ্রার ঘোরে সে স্বপ্ন দেখে—

সে সোনারপুরে আসিয়াছে—মামার সেই বাড়ীতে শঙ্কর আসিয়াছে—পলাতক আসামী শঙ্কর,—ধরা পড়িলে তাহাকে জেলে যাইতে হইবে—সে কোথায় কি করিয়াছে। কৃষ্ণা তাহাকে লুকাইয়া রাখিয়াছে, অতি সন্তর্পণে সে চলাফেরা করে যেন কেহ জানিতে না পারে—।

"কৃষ্ণা—ওঠো ওঠো, ষ্টেশান এসেছে, উঠে পড়ো—"

ধড়ফড় করিয়া কৃষ্ণা উঠিয়া বসিল,—দুই হাতে চোখ মুছিয়া সে তাকাইল—।

কোথায় সোনারপুর—কোথায় মামার বাড়ী, কোথায় শঙ্কর,—মাঝের গ্রাম ষ্টেশানে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, রাধাচরণ নামিয়াছেন—। পিছন দিকে তাকাইয়া কৃষ্ণা যাদবকে দেখিতে পাইল না, সম্ভব সে ষ্টেশানে প্রবেশ করিয়াছে।

কৃষ্ণা নামিল—।

অন্ধকার ষ্টেশান, তখনও গাড়ী আসিবার দেরী আছে, আলো জ্বলে নাই।

কৃষ্ণা ষ্টেশানে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিল, রাধাচরণ নিশ্চিন্ত মনে এক জায়গায় বসিয়া ঝিমাইতে লাগিলেন।

অন্ধকারের মধ্যেই যাদব আসিয়া কৃষ্ণার পাশে দাঁড়াইল—

"দিদিমণি—"

কৃষ্ণা চমকাইয়া উঠে,—যাদব যে আসিয়াছে, তাহা সে ভুলিয়া গিয়াছে।

যাদব পকেট হইতে একখানা পত্র বাহির করিয়া বলিল, "এই পত্রখানার কথা ভুলে গিয়েছিলুম—তোমাকে দেওয়ার কথা ছিল—বাবু এখানা দিয়েছেন।"

কৃষ্ণা পত্রখানা লইল।

উত্তেজিত কণ্ঠে যাদব বলিল, "আমি সবই জেনে গেলুম দিদিমণি,—গিয়ে বাবুকে বলব তোমার বাবা তোমায় বিক্রি করছেন এক বুড়োর কাছে; তুমি ইচ্ছা করলেই বাঁচতে পারতে কিন্তু তুমি তা করলে না।"

কৃষ্ণা একটু হাসিল, বলিল, "আমি ইচ্ছে করলেই বাঁচতে পারিনে যাদব-দা, তাই আমি স্বেচ্ছায় ওদের ইচ্ছার কাছে নিজের স্বাধীন মত দান করেছি।"

যাদব জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি সব জানো?"

কৃষ্ণা বলিল, "সব জানিনে, সব আমায় কেউ বলেনি, সামান্য শুনেছি। কিন্তু যা শুনেছি, তাই আমার যথেষ্ট শোনা হয়েছে যাদব-দা, আর আমি কিছু শুনতে চাইনে।"

এমন একরোখা মেয়ে যাদব কোনদিন দেখে নাই। স্বেচ্ছায় যে মরিতে চায়, তাহাকে বাঁচানোর চেষ্টা করা মিথ্যা—

রাধাচরণের তন্দ্রা ভাঙ্গিয়াছে, তাঁহার কাশির শব্দ পাইয়া যাদব সরিয়া গেল।—

১২

ব্রজনাথ শুনিলেন কৃষ্ণার বিবাহ এবং সে স্বেচ্ছায় আসে নাই।

যাদব চোখ মুছিয়া বলিল, "এমন একগুঁয়ে স্বভাবের মেয়ে যদি আর একটী দেখা যায় বাবু—নিজে ইচ্ছে করে না গেলে ওর বাপের ক্ষমতা হতো ওকে নিয়ে যাওয়ার বা বিয়ে দেওয়ার? আমি না হোক হাজার বার বলেছি—আমার সঙ্গে চল—কিছুতেই এলো না। আমায় স্পষ্টই বললে, মামার এই অবস্থায় তাঁর মাথায় আর দুর্ব্বহ বোঝা হয়ে চাপব না যাদব-দা, তার চেয়ে আমি এখানেই থাকি—।"

ব্রজনাথ হিসাবের খাতা দেখিতেছিলেন, একটীবারের জন্যও তিনি মুখ তুলেন নাই, কেবল মাত্র একটী শব্দ তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইল—"হুঁ—"

যাদব খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "বিয়েটা যদি ভালো ঘরে ভালো পাত্রে দিতো, আমি একটী কথাও বলতুম না বাবু কিন্তু যা ব্যাপার শুনলুম—"

ব্রজনাথ মুখ তুলিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ব্যাপার শুনলে ?"

যাদব বলিল, "আপনার ভগ্নিপতি, কৃষ্ণার বাবা—তাকে অনেক টাকা নিয়ে একজনের সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন,—সে লোকটা বুড়ো,—তার একটী মেয়েও নাকি আছে।"

ব্রজনাথ নিঃশব্দে যাদবের পানে তাকাইয়া রহিলেন।

তাহার পর খাতাপত্রগুলা সামনের বাক্সে তুলিয়া রাখিয়া সোজা হইয়া বসিলেন,—"তা হলে আজ আমাকেই যেতে হয় যাদব,—না হলে তো উপায় নেই। মেয়েটার ভবিষ্যৎ দেখতে হবে, তাকে যেমন করেই হোক ওদের কাছ হতে ছিনিয়ে আনতে হবে—নইলে—"

যাদব মলিন হাসি হাসিল, বলিল, "আপনি এখন কোথায় যাবেন বাবু, দিদিমণি তো সেখানে নেই, তার বাপ তাকে কাল রাত্রের ট্রেনে কলকাতায় নিয়ে এলো যে। ভোরের সময় শিয়ালদয় তাকে দেখলুম, বাপের সঙ্গে—আমার অনেক আগে চলেছে—ভিড়ের মধ্যে কোথায় তারা মিশে গেল দেখতে পেলুম না। বাইরে এসে তাদের খুঁজেছিলুম কিন্তু পাই নি।"

একটু থামিয়া সে আবার বলিল, "তা ছাড়া আজই যে বিয়ে,—আপনি তাকে আনবেনই বা কি করে ? অত বড় কলকাতা সহরে কোথায় তারা গেছে, কোথায় খবর পাবেন।"

"আজই বিয়ে—?"

ব্রজনাথ নিস্তব্ধ হইয়া যান।

শূন্য ঘরে একে একে অনেক কথাই মনে পড়িয়া যায়।

দুইটী ভাই বোন একত্রে লালিত পালিত হন। কমলা যখন মাত্র

পাঁচ বৎসরের তখন মা মারা যান। পিতা কাজ করিতেন, বাড়ীতে থাকিত দুইটী ভাই বোন—আর থাকিত যাদব।

মাতৃহারা ছোট বোনটীকে ব্রজনাথ অত্যন্ত বেশী স্নেহ করিতেন,—পিতার নিকট কোন আবদার না করিয়া কমলা তাঁহার নিকট আবদার করিতেন, ভাইও যে-কোন রকমে ভগিনীর আবদার পূর্ণ করিতেন।

গ্রামের স্কুল হইতে ম্যাট্রিক দিয়া ব্রজনাথ পিতার এক বন্ধুর নিকট বার্ম্মায় চলিয়া যান। পিতা পুত্রকে আর পড়াইতে চান নাই, ব্যবসা শিখাইবার জন্য তিনি তাঁহার ব্যবসায়ী বন্ধুর সহিত পুত্রকে বার্ম্মায় পাঠাইয়াছিলেন।

ব্রজনাথ প্রথম দু'তিন বৎসর একবার করিয়া বাড়ী আসিয়াছিলেন, পরে কয়বৎসর তিনি আসিতে পারেন নাই। তিন বৎসর পরে তিনি পিতার পত্রে কমলার বিবাহের সংবাদ পাইয়া মাত্র দুইদিনের জন্য বাড়ী আসিয়াছিলেন।

কমলার বিবাহ—পাত্র রাধাচরণ—

ব্রজনাথের আপাদ মস্তক প্রথম দর্শনেই জ্বলিয়া গিয়াছিল। তাঁহার বড় আদরের ভগিনী, পিতা বাছিয়া বাছিয়া এমন অপাত্রে তাহাকে সমর্পণ করিলেন, দেশে কি আর ছেলে ছিল না?

রাগ করিয়া তিনি আবার বার্ম্মায় চলিয়া যান। আর একবার আসিয়াছিলেন, পিতার মৃত্যুর সময়ে।

সেই সময়ে কমলার কথা তাঁহার কানে আসে,—তিনি আসিয়াছেন সংবাদ পাইয়া রাধাচরণ সসত্ত্বা স্ত্রীকে তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া দেন।

কমলার সম্বন্ধে বহু কথা ব্রজনাথের কর্ণ গোচর হয়। ব্রজনাথ কমলাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কোন উত্তর পান নাই,—স্বল্পভাষিণী কমলা কেবল জানাইয়াছিলেন—পরে সব জানাইব।

ব্রজনাথ যাদবকে এখানে রাখিয়া আবার রেঙ্গুণে চলিয়া গিয়াছিলেন, সেখান হইতেও কয়েকবার তিনি বাড়ী আসিয়াছেন, ভগিনীকে নিজের কাছে লইয়া যাইতে চাহিয়াছেন কিন্তু কমলা যান নাই।

দোষ কাহার, তাহা ব্রজনাথ আজও ভাবিয়া ঠিক করিতে পারেন না।

মনে পড়ে শক্তিময়ের কথা—

তাঁহার জনৈক বন্ধু ছিল সে,—ব্রজনাথ তাহারই সহিত কমলার বিবাহ দিবেন কথা দিয়াছিলেন। শক্তিময়ের বাড়ী এখানেই,—সে-ও ব্রজনাথের সহিত বার্ম্মায় কাজ শিখিতে গিয়াছিল।

বেশীর ভাগ সে ব্রজনাথের বাড়ীতেই থাকিত। সংসারে তাহার কেহ ছিল না, একখানি বাড়ী ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

ব্রজনাথ জানিতেন, কমলা শক্তিময়কে যেমন ভালোবাসিতেন, শক্তিময়ও তাঁহাকে তেমনই ভালোবাসিতেন। ইহাদের দু'জনকে উদ্বাহসূত্রে এক করিয়া তাঁহার নিকটেই রাখিবেন, ব্রজনাথের ইহাই ছিল উদ্দেশ্য।

কিন্তু পিতা তাহাতে রাজি হইলেন না—। শক্তিময়ের স্বাস্থ্য ভালো থাকিতে পারে, পত্নীর ভরণ-পোষণ করার ক্ষমতা ছিল না—পিতার অভিযোগ ছিল ইহাই। পুত্রের মত তিনি তাই গ্রহণ করেন নাই—।

চৌগাছা গ্রাম দূর হইলেও পাত্রের অবস্থা ভালো, লেখাপড়া না জানিলেও ক্ষতি নাই, খাওয়া পরার অভাব হইবে না—এবং বিশেষ

করিয়া এই দেখিয়াই কমলার পিতা কমলাকে এইখানে বিবাহ দেন।

বিবাহের এক বৎসরের মধ্যে রাধচরণের পিতামাতা মারা যান, এবং রাধাচরণ বিষয় সম্পত্তি দুই হাতে উড়াইতে সুরু করেন।

শক্তিময়ের পত্রে ব্রজনাথ এ সংবাদ পাইয়াছিলেন। শক্তিময় দেশেই ছিল, বিবাহ সে করে নাই, করিবে বলিয়া আশাও ছিল না।

মাঝে মাঝে সে চৌগাছায় যায়—এ সংবাদও সুদূর রেঙ্গুণে থাকিয়া রাধাচরণের পত্রে ব্রজনাথ জানিয়াছিলেন।

তিনি কমলাকে কড়া করিয়া পত্র দিয়াছিলেন—রাধাচরণ যে কমলার বিরুদ্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন, তিনি যে কথার উল্লেখ করেন নাই। শক্তিময়কেও তিনি একখানা পত্র দিয়াছিলেন—সে যেন চৌগাছায় আর না যায়।

এ-সব পত্রের কোন উত্তর তিনি পান নাই।

বাড়ী আসিয়া কমলার সহিত দেখা হইল—তখন রাধাচরণ কমলাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। শক্তিময়ের সঙ্গে আর দেখা হয় নাই, শুনা যায়, ঘর-বাড়ী বিক্রয় করিয়া দিয়া একদিন সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

এবার ফিরিয়াও ব্রজনাথ শক্তিময়ের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। সন্ধান মিলিল হঠাৎ একদিন শঙ্করের কাছে, কলিকাতা হইতে বাড়ী ফিরিবার পথে ট্রেনে তাহার সহিত দেখা হইয়াছিল।

তাহারই মুখে শুনা গেল—শক্তিময় জেলে রহিয়াছে। দীর্ঘ দুই বৎসরের জন্য সে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে, অপরাধ রাজদ্রোহীতা।

শক্তিময় নিজের নাম—উপাধি সবই বর্জ্জন করিয়াছে, তাহার নাম

এখন দীনবন্ধু—শক্তিময় নয়। এই সব ছেলেদের দেশসেবার প্রেরণা দিয়াছে সেই,—। ইহাদের মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিবার ইচ্ছা লইয়াই সে কাজে নামিয়াছে।

শঙ্করের পথ প্রদর্শক সে, কেবল শঙ্করই নয়, অনেক ছেলেকে সে এ মন্ত্র দান করিয়াছে—আজ সে জেলে থাকিলেও এই সব ছেলেরা তাহাকেই গুরু বলিয়া জানে, তাহারই নির্দ্দেশিত পথে চলে।

ছন্নছাড়া জীবন—

দোষ কাহার তাই ব্রজনাথ আজও ঠিক করিতে পারেন নাই।

কমলা কলঙ্কিনী আখ্যা লইয়াছিলেন—রাধাচরণ পত্নীকে অনেক লাঞ্ছনা দিয়া, অনেক নির্য্যাতন করিয়া তাঁহাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, অথচ কমলা সত্যই কোন অপরাধ করেন নাই, ব্রজনাথ তাহা জানেন। কমলার জীবন ছন্নছাড়া হইয়া গিয়াছিল, শক্তিময়েরও হইয়াছে।

ব্রজনাথ নিজেকেই অপরাধী মনে করিতেছেন। তিনি পূর্ব্বাবধি সবই জানিতেন, কেন জোর করিয়া তাহাদের বিবাহ দেন নাই, কেন পিতার উপর এত বড় একটা ভার দিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন, আজ তাহাই তিনি ভাবেন।

আজ কোথায় গিয়াছে কমলা, কোথায় গিয়াছে শক্তিময়, তাহাদের হইয়া শাস্তি ভোগ করিতে গেল, কমলার কন্যা কৃষ্ণা।

যাদব বলিয়াছে—রাধাচরণ জানাইয়াছে কৃষ্ণা তাহার কন্যা নহে এ কথা প্রকাশ হইলে দেশে, যে-কোন সমাজে তাহার মুখ দেখাইবার

পথ থাকিবে না। মায়ের সেই কলঙ্ক যাহাতে প্রকাশিত না হয়—সেই জন্যই কৃষ্ণা গিয়াছে এবং আত্ম-বলিদান দিয়াছে।

"বোকা মেয়ে—"

ব্রজনাথ হাসিতে যান—

আর একমাস সে অপেক্ষা করিতে পারিল না, একমাস পরেই ব্রজনাথ ফিরিতে পারিতেন, তাহাকে জোর করিয়া নিজের কাছে রাখিতেন। তাহাকে জানাইতেন, না-হয় কোন সমাজ তাহাকে গ্রহণ করিবে না, তিনি তাহাকে লইয়া নূতন সমাজ গড়িয়া তুলিবেন।

তাহার এ আত্মত্যাগে লাভ হইল কাহার—?

ব্রজনাথ অকস্মাৎ সচকিত হইয়া উঠেন—হাঁক দেন—"যাদব—"

কর্ম্মরত যাদব ছুটিয়া আসে—"ডাকছেন বাবু—"

ব্রজনাথ নীরবে আবার সামনের খাতাখানার পাতা উল্টাইতেছেন —দেখিয়া মনে হয় না, তিনি যাদবকে ডাকিয়াছেন।

যাদব খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া আবার কাজে যায়—।

ব্রজনাথ আবার হাঁক দেন—"যাদব—"

যাদব আবার আসে—।

ব্রজনাথ মুখ না তুলিয়াই জিজ্ঞাসা করেন, "আচ্ছা—তুমি ঠিক জানো যাদব—কৃষ্ণার সঙ্গে শঙ্করের বিয়ে হলেই ভালো হতো?"

যাদব উত্তর দেয়, "ঠিক জানি বাবু—মায়ের সঙ্গে কতদিন আমার এ নিয়ে কথাবার্ত্তাও হয়েছে। আমি একদিন শঙ্করের মায়ের কাছেও কথাটা বলেছিলুম—"

ব্রজনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তারপর—তিনি কি বলেছিলেন?"

যাদব উত্তর দিল, "তিনি বলেছিলেন, তা যদি হয় যাদব আমার কোন আপত্তি নেই—ছেলে আমার নিত্য জেলে যাচ্ছে, তার চেয়ে কৃষ্ণাকে বিয়ে করে সংসারী হয়ে বসবে—তাতে আমার মত আছে।"

ব্রজনাথ হুঙ্কার ছাড়েন, "এ কথা আগে বলনি কেন যাদব ?"

বিষণ্ণকণ্ঠে যাদব বলিল, "বললেও কোন ফল হতো না বাবু,—"

ব্রজনাথ একটু মুসড়াইয়া পড়িলেন, "কেন হতো না ?"

যাদব বলিল, "যারা দেশের ডাকে ঘর তুচ্ছ করে পথে বার হয়েছে বাবু, তারা কি আর নূতন করে ঘর বাঁধতে চায় ? মা বাপ, ভাই-বোন ঘর, সব তুচ্ছ করে ওরা বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে, বিয়ে ওরা করবে না—করতে পারে না। সেদিন রাত্রে আমি শঙ্করকে বিয়ের কথা বলায় সে হো-হো করে হেসে উঠলো, স্পষ্টই বললে, আমায় মাপ কর যাদব-দা, বিয়ে আমি এখন করতে পারব না। আর বিয়ে করেও তো সংসার বাঁধতে পারবো না, আমার কাজ দশের মাঝে—কোনদিন জেলে যাব কিম্বা কোনদিন ফাঁসির দড়িই গলায় ঝুলবে তার ঠিক কি ? আমাদের কাজের তো ঠিক নেই কিছু, নেতার নির্দ্দেশ মতে যে কোন কাজ আমরা করব—এরকম হলে বিয়ে করা চলে না। কেন আর একটী মেয়ের জীবনের ভার গ্রহণ করে, তাকে চিরকালের জন্য ভাসিয়ে যাব দুঃখের সমুদ্রে ?"

ব্রজনাথ নিস্তব্ধে যাদবের কথা শুনিয়া গেলেন।

১৩

রাত্রির অন্ধকারে শঙ্কর আসিল—

মায়ের অসুখের সংবাদ সে পাইয়াছে, মা নাকি তাহার নাম করিয়া দেখিতে চাহিয়াছেন, শঙ্করের কানে বহুদূরে থাকিয়াও এ কথা পৌঁছাইয়াছে।

তাহার নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়া আছে, যে তাহাকে ধরাইয়া দিতে পারিবে, সে পুরস্কার পাইবে—। এই বিপদের আশঙ্কা তুচ্ছ করিয়া শঙ্কর একদিন রাত্রির ঘন অন্ধকারে নিজেকে প্রচ্ছন্ন করিয়া গ্রামের বুকে আসিয়া দাঁড়াইল।

নিস্তব্ধ গ্রাম,—রাত্রি এগারোটার মধ্যেই সুষুপ্ত, জন-প্রাণীর সাড়া মাত্র নাই। শৃগালেরা নিঃশঙ্কচিত্তে পথে বেড়াইতেছে, গ্রাম্য কুকুর দুই একটা চীৎকার করিতেছে।

মাঘ মাসের রাত্রি—শীত বেশী। দুদিন আগে বেশ বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, পায়ের তলার মাটি আজও শুকায় নাই। শীতের হাওয়া বহিয়া যাইতেছে, চারিদিক কন্ কন্ করিতেছে।

নিঃশব্দ পদে শঙ্কর হাঁটিতেছে। পায়ের জুতার শব্দ মাঝে মাঝে শুনা যায়—যখন ইটে পায়ে হোঁচট লাগে।

"কে যায়—কে—?"

শঙ্কর থতমত খাইয়া দাঁড়াইয়া যায়—ব্রজনাথের কণ্ঠস্বর। এই শীতেও তিনি বাহিরে আছেন,—অন্ধকারে তাঁহাকে অস্পষ্ট দেখাইতেছে।

ব্রজনাথের কণ্ঠস্বর আবার শুনা গেল, "পথে কে ?"

এবার শঙ্কর আস্তে আস্তে নিকটে আসিল, চাপা সুরে বলিল,— "আমি,—আমি জ্যেঠামশাই, আমি শঙ্কর। আপনি এতরাত্রে এই ঠাণ্ডায় বাইরে কেন জ্যেঠামশাই,— ?"

ব্রজনাথ একটু হাসিলেন, বলিলেন, "আমি সন্ধ্যা বেলায় ঘরে থাকতে পারিনে। খানিকটা ঘুরে এই সবে বাড়ী ফিরছি, কিন্তু তুমি কোথায় যাচ্ছো শঙ্কর ? না না, পথে দাঁড়িয়ে কথা বলা ভালো নয়, ওদিকে কথা শোনা যাচ্ছে—লোক আসছে। তোমায় দেখে কেউ চুপ করে থাকবে না—জানো তো—তোমার অনেক শত্রুও আছে। আমার ঘরে এসো—ওরা আগে চলে যাক—"

সত্যই পথের বাঁকে আলোর ছটা দেখা যায়, দুইজন মানুষের কথার শব্দও কানে আসে। শঙ্কর চলিতে চলিতে বলিল, "ভাগ্যে পথে ছিলেন জ্যেঠামশাই, নইলে—"

ব্রজনাথ বলিলেন, "নইলে ওই ভাগীরথ এখনই থানায় খবর দিতো আর তুমি মায়ের বিছানার পাশেই হাতে শিকল পরতে। পুরস্কারের টাকাটা ভাগীরথের অদৃষ্টেই জুটতো।"

রুদ্ধ দরজায় আঘাত করিয়া ব্রজনাথ ডাকিলেন—"যাদব, আমি এসেছি, দরজা খোল।"

ভিতরে যাদবের গর্জ্জন শোনা গেল, "এই ঠাণ্ডায় কীর্ত্তন না শুনতে

গেলে চলতো না বাবু? এই যে পরশু দিন বুকে ব্যথা ধরে যাচ্ছিলেন, কালকের দিনটা ভালো থাকতে না থাকতে—”

বলিতে বলিতে দরজা খুলিয়াই সামনে শঙ্করকে দেখিয়া সে চুপ করিয়া গেল—।

ব্রজনাথ হাসি মুখে বলিলেন, “কীর্ত্তন শোনা কি বড় কথা,—আসল কথা হচ্ছে পাঁচজনের সঙ্গে দেখাশোনা হওয়া, একটু গল্প করা। এসো শঙ্কর ঘরে ঢুকে পড়—”

শঙ্করের ঘরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে ব্রজনাথ দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন—। শঙ্কর জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিতে বলিলেন, “দরজাটা বন্ধ রাখাই ভালো। ভাগীরথ যত ভালো ব্যবহারই করুক, আসলে শকুনের মত ওর চোখ পড়ে থাকে ভাগাড়ের দিকে। ভাগীরথ ফাঁড়ির লোক, হ’লই বা সামান্য চাকরী, তবু তারই বীরত্বে দেশের লোক অস্থির। ছোট কাজে সুবিধা অনেক,—এরা সব জায়গায় সমান ভাবে মিশবার সুযোগ পায়—”

“রায় মশাই—অ-রায় মশাই, বাড়ী আছেন কি?”

ব্রজনাথ উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, “শঙ্করকে পাশের ঘরে নিয়ে যাও যাদব, মনে হয় সন্দেহ করেছে।”

যাদবের আহ্বানে শঙ্কর তাহার সঙ্গে পিছনের পথে সরিয়া গেল। সেদিককার দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া খানিক পরে ব্রজনাথ সামনের দরজা খুলিলেন—বিস্মিত সুরে বলিলেন, “এই রাত্রে ভাগীরথ যে—”

ভাগীরথ হাতের আলো তুলিল, সবিনয়ে বলিল, “আজ্ঞে, আপনি

কার সঙ্গে কথা বলছিলেন, সাড়া পেয়ে এলুম। খাওয়া-দাওয়া হয়নি বুঝি এখনও—বিরক্ত করলুম কিনা”—

পিছন হইতে রুক্ষকণ্ঠে যাদব বলিল, “ঢের হয়েছে. আর আদি-খ্যেতায় কাজ নেই। রাত বারোটার সময় আমাদের ভাগীরথ সিং জানতে এসেছে বাবুর ভবিষ্যৎ কি রকম আছে? ভেগে পড় ভাগীরথ সিং, রাত দুপুরে জ্বালিয়ো না—সহ্যি হয় না। বাবুকে খেয়ে দেয়ে শুতে দাও এখন।”

অপ্রস্তুত ভাগীরথ একটা লম্বা সেলাম ঠুকিল, তাহার পর বাহির হইয়া গেল।

যাদব বারাণ্ডায় উঠিতে উঠিতে বলিল, “চোখ বটে একখানা—আন্দাজ করে এসেছে বাবু, সঠিক কিছু জানলে এতক্ষণ ঘরে ঢুকতো। যাক—পরম নিশ্চিন্ত, শঙ্করকে সোজা ওদের খিড়কি দরজায় পৌঁছে দিয়েছি—এই তো বাগানটা মাঝে। চলুন আপনাকে খেতে দেই এবার।”

আহারে বসিয়া ব্রজনাথ চিন্তিত মুখে বলিলেন, “শঙ্করের এখন আসাই অনুচিত হয়েছে—আর কয়টা দিন পরে এলে ভালো হতো। ওদের নামে যে মামলাটা চলছে, সেটা মিটে গেলে আর ওর কোন ভয় থাকবে না, তখন এলে ওর বাপ ছাড়া আর কেউ একটা কথাও বলতে পারতো না।”

মাস তিনেক আগে কলিকাতায় একটা বড় রকম ডাকাতি হইয়া গেছে, সেই ডাকাতি কেসে শঙ্করও জড়াইয়া পড়িয়াছে, সেইজন্যই সে এখন পলাতক। পুলিস সন্ধান পাইয়াছে শঙ্কর যেখানেই থাক মাঝে

মাঝে মাকে দেখিতে গ্রামে আসে এবং সেইজন্যই গ্রামের বুকে ও
পাতিয়া বসিয়া আছে।

মামলা চলিতেছে, পুলিস শঙ্করের নাম জানিলেও মামলার আসামীরা
শঙ্করকে জড়ায় নাই বরং একেবারে অস্বীকার করিয়াছে। একজন
মাত্র সাক্ষী শঙ্করের নাম করিয়াছে। পুলিস শঙ্করকে ধরিবার চেষ্টায়
আছে কিন্তু শঙ্কর পলাতক,—সে কোথায় কি ভাবে আছে সে সন্ধান
কেহ জানে না।

ব্রজনাথ চিন্তিতমুখে আহার শেষ করিয়া উঠিলেন, বলিলেন,
"একবার খোঁজটা নিয়ো যাদব—শঙ্কর গেছে না আছে। ওকে বলে
দিয়ো, এখন এখানে এ কয়দিন না আসাই ওর ভালো,—ধরা পড়ে
অনর্থক শুধু হয়রাণ হবে—যদিও পরে সে-ও মুক্তি পাবে। দরকার
কি সেই হয়রাণ হওয়ার, তার চেয়ে আর কয়টা দিন এমনিই থাক।"

তাহার পর কতকটা স্বগত ভাবে বলিলেন, "যাক কৃষ্ণার সঙ্গে
ওর বিয়ে না হওয়ার দরুণ আমার মনে যে ক্ষোভ জেগেছিল তা মিটে
গেছে। এ ছেলে কখনও ঘরের মায়ায় জড়াতে পারে না, এরা এমনি
করে পথে পথেই ফিরবে। একটার মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকতে এরা
জন্মায়নি, এদের কাজ বহুমুখী, সারা বিশ্বের সঙ্গে জড়িয়ে থাকবে
এরাই—"

বলিতে বলিতে মুখ তুলিয়া দেখিলেন—যাদব বিস্মিত নেত্রে তাঁহার
পানে তাকাইয়া আছে।

ব্রজনাথ শ্রান্তভাবে বিছানায় শুইয়া পড়িলেন—বলিলেন, "খাওয়াটা
সেরে নিয়ে যেয়ো যাদব, একবার খোঁজ নিয়ো—"

যাদব বাধা দিল, "আমি জানি বাবু—আপনি এখন নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোন দেখি। এর পর কালই যে আবার বলবেন—হাঁপানি বেড়েছে, বুক ব্যথা করছে—এবার আমি আর সে সব কথা শুনব না বাবু। সঙ্গে সঙ্গে পুঁটলী বেঁধে তখনই আপনাকে নিয়ে গিয়ে সোজা উঠব আহিরীটোলায়—এ কথা কিন্তু বলে রাখছি।"

ব্রজনাথ চুপ করিয়া রহিলেন।

যাদব বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, কর্ম্মশক্তি ফুরাইয়া গেলেও সে তবু ছাড়ে না, যতখানি পারে যেমন করিয়াই হোক কাজ করিয়া যায়। তাহাকে বিব্রত করিতে মমতা হয় কিন্তু উপায়ও নাই। বাল্যে কোন কালে একবার হাঁপানী উঠিয়াছিল, বহুকাল পরে নূতন মূর্ত্তিতে সে আবার দেখা দিয়াছে।

যাদব কখন বাহির হইয়া গিয়াছিল—ফিরিয়া আসিয়া দরজা বন্ধ করিয়া ফিরিয়া দেখিল, ব্রজনাথ জাগিয়াছেন।

যাদব বলিল, "শঙ্কর এই মাত্র চলে গেল বাবু, তাকে আপনার কথা বলে দিয়েছি।"

সে শুইয়া পড়িল।

১৪

সহরের নাম করা ধনী—

বিশ্বেন্দু নারায়ণ চৌধুরীর বিশাল অট্টালিকা—।

এই বাড়ীতে বধূরূপে প্রবেশ করিয়াছে কৃষ্ণা—

এই বিবাহের কত বড় ইতিহাস—সে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দুর্ভাগিনী কৃষ্ণার নামটাই উজ্জ্বল হইয়া রহিল।

বিশ্বেন্দু চৌধুরীকে সবাই চেনে—উপস্থিত তিনি পেন্‌শান পাইতেছেন—এককালে গভর্ণমেণ্টের বড় চাকুরে ছিলেন এবং রায় বাহাদুর উপাধিও লাভ করিয়াছেন।

এত বড় কর্ত্তব্যনিষ্ঠ লোক নাকি এককালে বিরল ছিল, আজ তিনি পেন্‌সান লইলেও কত লোক তাঁহার কাছে পরামর্শ লইতে আসে—এখনও তিনি বে-সরকারী পরামর্শ দাতা রূপে গভর্ণমেণ্টের অনেক কাজ করিয়া দেন।

বয়স তাঁহার সত্তরের কাছাকাছি,—লোকে বলে আটষট্টি হইবে; নিজের বয়স লইয়া যাচাই করার ইচ্ছা তাঁহার কোনকালেই ছিল না, বর্ত্তমানেও নাই। বয়স হইলেও তিনি বেশ শক্ত আছেন—এখনও তিনি সোজা হইয়া হাঁটেন,—চোখে এখনও স্পষ্ট দেখিতে পান।

কোন সূত্রে কেমন করিয়া রাধাচরণ চক্রবর্ত্তীর সহিত তাঁহার পরিচয় হয় এবং এই বয়সে তিনি বিবাহ করিতে ইচ্ছা জানান।

তাঁহার একমাত্র কন্যা—নাতনী, তাহারা দূরে থাকে—এত বড় বাড়ীতে নিজের বলিতে তাঁহার কেহই নাই—নেহাৎ নাকি সেইজন্যই তাঁহার বিবাহ করা। দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে পত্নী গতায়ু হইয়াছেন, এতকাল বিবাহ করিবার আবশ্যকতা তিনি বোধ করেন নাই। বর্ত্তমানে জানিয়াছেন তাঁহাকে দেখিবার জন্য একজন লোকের আবশ্যক।

হয় তো আরও কত স্থানে বিবাহের চেষ্টা হইয়াছে—সকল স্থানেই তিনি ব্যর্থ হইয়াছেন।

রাধাচরণ কন্যাসহ তাঁহার বিশাল অট্টালিকায় উঠিয়াছেন এবং এইখানেই যথারীতি কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন। পাড়ার লোকে এ সংবাদ বিন্দু বিসর্গ জানিতে পারে নাই, তবু যদি জানিতে পারিয়া তাহারা দাঙ্গা বাধায়—এজন্য রায় বাহাদুরের দরজায় সে দিন বেশী প্রহরীর ব্যবস্থা ছিল।

সুন্দরী কৃষ্ণা রায় বাহাদুরের সহধর্ম্মিনী, এই বিশাল সম্পত্তি ও বিশাল প্রাসাদের অধিস্বামিণী।

কৃষ্ণার বিবাহে রাধাচরণ দুই হাজার টাকা পাইয়াছেন—টাকা পাইবার পরদিন সকালেই তাঁহার বাড়ী ফিরিয়া যাইবার কথা।

কৃষ্ণা একদিনেই এ বাড়ীর হালচাল বুঝিয়া লইয়াছিল,—সে ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল রাধাচরণ যান নাই, বাহির বাড়ীতেই আছেন; বিবাহের তিন চার দিন পরে কৃষ্ণা রাধাচরণকে ডাকিয়া পাঠাইল—

ভিতর বাড়ীর সহিত রাধাচরণের পরিচয় ছিল না, প্রবেশ করিতেও ভয় হয়। তবু তাঁহারই কন্যা এ বাড়ীর কর্ত্রী—এই ভরসায় তিনি ভিতর বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন—

মাঝখানকার সুসজ্জিত বড় ঘরটীতে কৃষ্ণা দাঁড়াইয়া ছিল, ভৃত্য সেই ঘরের দরজায় রাধাচরণকে পৌঁছাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

সবুজ রংয়ের সিল্কের পরদা, সরাইতে গিয়া কাঁচের পুঁথির মালা গুলি ঝিন ঝিন শব্দ করে—অতি সন্তর্পণে পরদা সরাইয়া রাধাচরণ ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

সুসজ্জিতা কৃষ্ণার পানে তাকাইয়া তাঁহার চমক লাগে। সর্ব্বাঙ্গে হীরকালঙ্কারের দ্যুতি, চোখ যেন ধাঁধিয়া যায়। মুগ্ধ বিস্ময়ে রাধাচরণ কৃষ্ণার পানে তাকাইয়া থাকেন।

কৃষ্ণা কথা বলিল, তাহার কণ্ঠস্বরে রূঢ়তার আভাস—

"আপনি যে আজও এখানে রয়েছেন—বিয়ের পরদিনই আপনার চলে যাওয়ার কথা শুনেছিলুম না—?"

অকস্মাৎ যেন রাধাচরণের চমক লাগে,—তিনি বেশ একটু সন্ত্রস্ত হইয়া পড়েন—। মাথা চুলকাইয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু শরীরটা একটু খারাপ মত হয়েছিল কিনা, সেইজন্যে ওঁরা বারণ করলেন বলেই যাওয়া হয়নি।"

কুঞ্চিত মুখে কৃষ্ণা বলিল, "ওঁরা বারণই করুন—আর পায়েই ধরুন, আপনার এখানে থাকা মোটেই উচিত হয়নি—সেটা তো বুঝতে পারছেন।"

রাধাচরণ বিস্মিতকণ্ঠে বলিলেন, "কেন?"

কৃষ্ণা দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল—"আবার জিজ্ঞাসা করছেন কেন? আপনি কন্যাদান করেন নি, কন্যা বিক্রয় করেছেন। মূল্য যখন বিয়ের সময়েই পেয়েছেন, তারপর আর এক মুহূর্ত্ত এ-বাড়ীতে থাকা আপনার উচিত হয়েছে কি?"

রাধাচরণ কি বলিতে যাইতেছিলেন, কৃষ্ণা বাধা দিল, "থাক আর নিজের পক্ষ সমর্থন করে নির্দ্দোষী সাজতে হবে না। এখানে বাড়ীর লোক আপনাকে কি না বলছে—তবু আবার তাদের নামে দোহাই দিয়ে এখানেই আপনি থাকতে চান—ছিঃ— !"

রাধাচরণ বলিতে গেলেন—"আমি এখানে থাকতে চাই একথা সত্য নয় কৃষ্ণা—আমি—"

কৃষ্ণা সংযত কণ্ঠে বলিল, "আপনার আজ এখনই এখান হতে চলে যাওয়া উচিত। যে বাড়ীতে মেয়ে বিক্রি করে, সেই টাকা পকেটে পুরেছেন, সেই বাড়ীতে আর এক মিনিট থাকা আপনার পক্ষে একেবারে অন্যায়, একেবারে বিসদৃশ—।"

কথাটা শেষ করিয়াই সে পাশের দরজা পথে বাহির হইয়া গেল, রাধাচরণের মুখের ভাব কিরূপ হইল তাহা দেখিবার জন্য একবার পিছন ফিরিয়া চাহিল না।

এত বড় বাড়ীর অধিশ্বরীরূপে সে আসিয়াছে—এ তাহার সব চেয়ে বড় অপমান, তাহার মনুষ্যত্বের অপমান, তাহার আত্মার অপমান।

শেষ পর্য্যন্ত সে দেখিতে চায়, সে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। অদৃষ্ট তাহাকে কোন পথে কোন খানে লইয়া যাইবে, সেই চরম পরিণতিটা কি, কৃষ্ণা তাহাই দেখিবে। বিবাহের আগে দুই একবার সে আত্মহত্যার কথা ভাবিয়াছিল—সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করের কথা মনে জাগিয়াছিল—"আত্মহত্যা করে কাপুরুষে—মানুষ করে না।" মানুষ যে হয় সে সর্ব্ব অবস্থায় কালকে বরণ করিয়া লইবে; যুদ্ধ করিয়া বাঁচিবে এবং অগ্রসর হইবে।

আজ নির্জ্জন ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া কৃষ্ণা কঠিন মেঝেয় লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিল।

কেন—কেন—কেন—

আপনার মনেই সে প্রশ্ন করে—কেন সে মরিল না, কেন সে সকল গ্লানি, সকল নিন্দা কুৎসার হাত হইতে মরিয়া এড়াইল না ?

কৃষ্ণা কাঁদিল—কেন সে শঙ্করের কথা মনে করিল—ভবিষ্যতের পানে না তাকাইয়া চলার বেগে কেন সে চলিল, কেন সে থামিল না—? জীবন যুদ্ধে পরাজিত সেকি হয় নাই—? তিলে তিলে মৃত্যু বরণ করার চেয়ে একেবারেই মরিয়া যাওয়া ভালো ছিল না কি ?

রুদ্ধদ্বারে আঘাত করিয়া দু' তিনজন ফিরিয়া গেল, কৃষ্ণা উত্তরও দিল না, দরজাও খুলিল না।

দিনের আলো যখন প্রায় মিলাইয়া আসিতেছিল তখন কৃষ্ণা দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

দ্বিতলের এই বারাণ্ডার ওদিকে যতদূর দৃষ্টি যায়, দেখা যায় শুধু ধান গাছ—তাহারই উপর দিয়া যখন বাতাস বহিয়া যায় তখন বঙ্গ কবির প্রসিদ্ধ সেই গাথা মনে পড়ে—

এমন ধানের ক্ষেতে দোল দিয়ে যায়
বাতাস কাহার দেশে—

বারাণ্ডার রেলিংয়ে ভর দিয়া কৃষ্ণা শূন্যদৃষ্টিতে পশ্চিমের আকাশের পানে তাকাইয়া রহিল। অস্তমান সূর্যের আরক্তিম আভায় সমস্ত আকাশ আজ লাল হইয়া উঠিয়াছে—সেই রঙিন আলো যাহা কিছু স্পর্শ করিয়াছে সবই রঙিন করিয়া তুলিয়াছে।

এদিকে নামিয়া আসিতেছে মৃদু অন্ধকার—এইটুকু আলোর চিহ্ন মুছিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে সে অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া সমস্ত দেশ ছাইয়া ফেলিবে—।

এ অন্ধকার সারারাত্রি ব্যাপী, রাত্রি শেষে আবার দিনের আলো ফুটিবে,—অন্ধকার ধরণীর বক্ষ হইতে নিঃশেষে মুছিয়া যাইবে, কৃষ্ণার মনের অন্ধকার দূর হইবে কি ?

"নতুন মা—পূজোর ঘরে একবার যেতে হবে যে—সন্ধ্যে প্রদীপটা—"

কৃষ্ণা ফিরিয়া তাকাইল—

সেই মুহূর্ত্তে মনে পড়িয়া গেল—"সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালিবার ভার সেই গ্রহণ করিয়াছে বটে। এই দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর কাল গৃহিণীহীন বাড়ীর ঠাকুর ঘরে সন্ধ্যাপ্রদীপ কে জ্বালাইয়াছে কে জানে—গতকাল হইতে এ ভার পড়িয়াছে তাহারই মাথায়। বাড়ীর কুল পুরোহিত কাল ঠাকুর ঘরে মহাধূমধামে পূজা করিয়াছেন, সন্ধ্যাদীপ বাড়ীর নূতন গৃহিণীর হাতে তুলিয়া দিয়াছেন :

ভাগিনেয় অজয় দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া মজা উপভোগ করিয়া-ছিল। সম্প্রতি সে বিলাত হইতে ডাক্তারী পাস করিয়া আসিয়াছে, এখনও কর্ম্মভার গ্রহণ করে নাই।

কোনদিনই সে এই ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করে নাই। তাহার মামা বাবুরও ঠাকুর ঘরের উপর আনুরক্তি সে কোনদিন দেখিতে পায় নাই। বহুকালের প্রতিষ্ঠিত কুলদেবতা এত বড় বাড়ীর কোনখানে নিজেকে লুপ্ত করিয়া আছেন কেহ তাহার খোঁজও রাখে না। পুরোহিত প্রতিদিন কোন রকমে নিজের শুচিতা বাঁচাইয়া পূজার সাজ হাতে লইয়া বেতন

ভোগীর নিয়মিত কাজ করিয়া যান, কোন রকমে অং বং করিয়া শুদ্ধ অশুদ্ধ ভাবে মন্ত্র উচ্চারণ করেন, কেহ তাহা দেখেও না।

কুললক্ষ্মী আসিয়াছে—

বিবাহের সংবাদ পাইয়া অজয়ের মাতা রায় বাহাদুরের কনিষ্ঠা ভগিনী শ্যামবাজার হইতে আসিয়াছেন, তিনিই এই চিরাচরিত প্রথা আবার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

নেহাৎ মেয়েটির সহিত পরিচয় নাই বলিয়াই অজয় তখন কোন কথা বলে নাই—আজ নূতন মামীর সহিত আলাপ করিতে দুইবার আসিয়া সে ফিরিয়াছে।

কৃষ্ণা সারাদিন ঘরের বাহির হয় নাই, তা ছাড়া অজয়ের পরিচয়ও সে পায় নাই। এ বাড়ীর অনেকেই এখনও তাহার অপরিচিত।

আজও সন্ধ্যাদীপ জ্বালিতে চলিল কৃষ্ণা, অন্তর এ কাজ করিতে বিরূপ হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু যেমন ভাবে নিঃশব্দে সে আত্মদান করিয়াছে, তেমনই ভাবে এ বাড়ীর প্রত্যেকটী আচার অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সে দ্বিরুক্তি করিল না।

১৫

রাত্রি বাড়িয়া উঠিতেছে—

নিজের ঘরের জানালায় কৃষ্ণা দাঁড়াইল।

ব্লাক আউটের রাত্রি, কোথাও একটি আলো দেখা যাইতেছে না। পথের আলোগুলি একেবারেই জ্বলে নাই, পথও একেবারে পথিকত্যক্ত।

কৃষ্ণা অন্ধকারের পানে তাকাইয়া ছিল।

কোথায় ক্ষুদ্র গ্রাম সোনারপুর, আর কোথায় কলিকাতার বরেণ্য স্থান বালিগঞ্জ। মামার বাড়ীর জীর্ণ পুরাতন ঘর—সামান্য আসবাব; —সেখানে সব কাজই নিজেকে করিতে হইত,—অবশ্য যাদব যতখানি পারিত তাহাকে সাহায্য করিত।

স্বাধীন ছিল সে, তাহার চিন্তাও ছিল সেখানে স্বাধীন। এখানে কৃষ্ণা হাঁফাইয়া উঠিয়াছে। বনের পাখী, স্বেচ্ছায় সোনার খাঁচায় প্রবেশ করিয়াছে, কতদিন এই সুখভোগ তাহার অদৃষ্টে আছে কে জানে?

আজ তিনদিন সে আসিয়াছে,—বিবাহের সময় মাত্র সে রায় বাহাদুরকে দেখিয়াছে। গতকাল এবং আজ তিনি ভিতর বাড়ীতে একবার আসিয়াছেন বটে, কৃষ্ণার সহিত তাঁহার দেখা হয় নাই।

এদিক দিয়া কৃষ্ণা বাঁচিয়াছে,—সে নিঃশ্বাস ফেলিয়াছে।

বৃদ্ধ বিশ্বেন্দু নারায়ণ, তাঁহার পানে চাহিয়া তাহার করুণাই হইয়াছিল,

রাগ হয় নাই। এই লোক কেন যে বিবাহ করিল তাহাই সে ভাবে; মাথার চুল সাদা হইয়া গেছে,—গাত্র চর্ম্ম লোল হইয়া পড়িয়াছে, তিনি বিবাহ করিয়াছেন কৃষ্ণাকে।

নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবিয়া কৃষ্ণার হাসি পায়—

কি হইতে পারিত সে—কি সে হইল। সে ভাবিয়াছিল, ইউনিভার্সিটির সব কয়টী ডিগ্রি সে লইবে, ইহার মধ্যে সে দেশের কাজ করিবে, শঙ্করদা যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছে সেও সেই ব্রত পালন করিয়া যাইবে।

কিন্তু কি হইতে গিয়া কি হইয়া গেল, সে ব্রত হিসাবে যে মন্ত্র লইয়াছিল তাহা ব্যর্থ হইয়া গেল, সে কিছুই করিতে পারিল না।

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে কৃষ্ণার চিন্তাজাল ছিঁড়িয়া গেল,—বাহির হইতে কে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি কি ভিতরে আসতে পারি?"

কথাটা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলিয়া দু' পাশে পর্দ্দা সরাইয়া দাঁড়াইল অজয়—তাহার দুইটি চোখে কৌতুকময় দৃষ্টি।

এই ছেলেটিকেই কৃষ্ণা কাল বৈকালে দেখিয়াছে—মা নূতন মামীর সহিত আলাপ করাইয়া দিতে আসিয়া বলিয়াছিলেন, "প্রণাম করতে হয় অজু, নতুন মামী তোর, পূজনীয়া লোক—"

সকৌতুকে অজয় বলিয়াছিল, "ওইখানেই তো গোল বাধিয়েছ মা, সম্পর্ক যতই গুরুতর হোক, বর্ত্তমান কাল মাথা নোয়াতে নিষেধ করেছে যে। আমরা ইয়ংম্যান, বিংশ শতাব্দীর নায়ক, আমরা সমান-সমান ব্যবহার করব, বড় জোর হাতখানা তুলে কপালে ঠেকাতে পারি, প্রণামের ব্যবস্থাটা তোমরাই করে নিয়ো যাহোক করে। হ্যাঁ, আমাদের

রাণী গিন্নিও একথা জানেন নিশ্চয়ই, তোমাদের ঊনবিংশ শতাব্দীতে উনি তো জন্মান নি—”

“রাণী গিন্নি—” কৃষ্ণার মুখখানা লাল হইয়া উঠিয়াছিল, মুখ ফিরাইয়া সে খানিক তবু দাঁড়াইয়াছিল সে কেবল শিষ্টাচারের জন্যই।

অজয়ের মা রাগ করিয়া বলিয়াছিলেন, “চুলোয় যাক তোর বিংশ শতাব্দী—অধঃপাতে যাক তোদের এই বর্ত্তমানের শিক্ষা যা গুরুজনকে উপযুক্ত সম্মান দেখাতে দেয় না। আমাদের সময়ে দেশে যে নতুনত্বের ঢেউ এসেছিল, তার মধ্যেও আমরা যদি টিঁকে থাকতে পারি, আমাদের পুরানো আচার নিষ্ঠাকে ধরে রাখতে পারি, তোরা কেন তা পারবিনে অজু, তোরা কেন এই যুগের হাওয়ায় ভেসে যাবি?”

অজয় মৃদু মৃদু হাসিয়াছিল, বৃদ্ধা মাকে উত্যক্ত করিতে সে চায় নাই। নিজে সে যাহাই হোক, মায়ের ধর্ম্ম বিশ্বাসে সে আঘাত করে নাই, মায়ের সংস্কারে সে বিদ্রূপ করে নাই।

কাল সন্ধ্যায় গৃহলক্ষ্মীরূপে কৃষ্ণা যখন ঠাকুর ঘরে প্রদীপ জ্বালিতেছিল, অজয় তখন বারাণ্ডায় থাকিয়া সকৌতুকে সে দৃশ্য উপভোগ করিয়াছে। একবার মাত্র তাহার পানে তাকাইয়া কৃষ্ণা নিজের ঘরে চলিয়া আসিয়াছিল, আর তাহার সহিত দেখা হয় নাই।

আজ তাহাকেই দরজার উপর আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া কৃষ্ণা কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না।

তাহার বিব্রত মুখের পানে তাকাইয়া মৃদু হাস্যে অজয় বলিল, “কিছু মাত্র ভাবতে হবে না রাণী মামী, যেমন অনাহূত এসেছি তেমনি অনাহূত ভাবেই চলে যাব,—এ দেবতার আবাহনও নেই—বিসর্জনও নেই—

বিব্রত করাটা যে আমার উদ্দেশ্য নয় তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। অতএব মাভৈ; আমায় দেখে শঙ্কিত, ত্রস্ত, চকিত, উদ্বেলিত—সর্ব্বশেষে কুপিত হওয়ার কোন কারণ নেই।"

কৃষ্ণা হাসিল, বলিল, "না ত প্রত্যয়ন্ত কোন কিছুই হয়নি, আপনি নিঃশঙ্কে আসুন—আসন গ্রহণ করিতেও পারেন অনায়াসে।"

ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া গদী চেয়ারটায় ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িয়া অজয় বলিল, "বাঁচালে রাণী মামী,—তোমার কঠোর গম্ভীর মুখখানা দেখে সত্যিই বড় আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলুম। ভাবছিলুম—পঁচিশ বছর একনিষ্ঠ পত্নী-প্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিয়ে আমার মামা শেষকালে কি একটি পেচকী বরণ করে আনলেন? আমরা না হয় দুদিনের অতিথি, আজ আছি কাল চলে যাব, কিন্তু মামা আমার এই পেচকীকে নিয়ে দিনের পর দিন যাপন করবেন কি রকমে? যাক, আশ্বস্ত হয়েছি তোমার মুখে হাসি দেখে আর কথা শুনে। এবার জানলুম—না, তোমার মধ্যে মনুষ্যত্ব বোধ আছে, নেহাৎ অমানুষ নও।"

কৃষ্ণা বলিল, "হাসি আমার কোনকালেই নেই, হাসতে আমি পারিনে—হাসতে গেলেই—"

অজয় বাধা দিল—"কান্না আসে—কিন্তু আমি হাত যোড় করছি রাণী মামী, ওই কাজটি করো না। শুনেছি সুন্দরী নারীর চোখের জল দেখতে বড় সুন্দর, কবিরা তার অনেক বর্ণনা করেছেন, সাহিত্যিকেরা তা নিয়ে অনেক লেকচার ঝাড়েন, কিন্তু আমি বলব—কাঁদলে সবাইকেই ভারী বিশ্রী দেখায়, সৌন্দর্য্য তাতে মোটে নেই। তা ছাড়া যে দেখে তার মনটাও বড় খারাপ হয়ে যায়। আচ্ছা যদি অভয় দাও রাণী মামী,

আমি তোমার হাসাবার ভার নেব, দিনরাত এমন হাসি হাসাব যাতে বলবে আর না—থামো। কিন্তু তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন বলো তো —বসো।”

সে উঠিয়া সামনের চেয়ার খানা আগাইয়া দিল—কৃষ্ণা সেখানায় না বসিয়া অন্যটায় বসিল।

অজয় বলিল, “যদিও এটা ভদ্রতা বিরুদ্ধ তবু মেনে নিলুম রাণী মামী। বিলেতের মেয়েদের আমরা যতই খারাপ বলি না—তারা এটুকু উপকার নিয়ে থাকে—ধন্যবাদও দেয়। আর তোমরা—নিরেট খাঁটি বাঙ্গালীর মেয়ে, লজ্জায় সঙ্কোচে জড়সড়, ধন্যবাদ পাছে দিতে হয় তাই ভিন্ন আসনে বসো।”

কৃষ্ণা বলিল, “আপনাকে একটা অনুরোধ করছি—রাণী শব্দটা মামীর আগে যোগ করবেন না। রাণী শব্দটার অর্থ আমি বুঝছিনে —কেবল মামী বলে ডাকলে বিশেষ বাধিত হব।”

অজয় বলিল, “তোমার অনুরোধ সযত্নে রক্ষিত হল, কিন্তু আমারও একটা অনুরোধ আছে—আমি যখন ভাগনে বয়সে বড় হলেও সম্পর্ক ধরে ‘আপনি’ বাক্যটা ত্যাগ করতে হবে।”

গম্ভীর মুখে কৃষ্ণা বলিল, “তাই হবে, বয়সে বড় হলেও সম্পর্ক হিসাবে যখন আমি বড়—ছোটর মতই ব্যবহার করা যাবে।”

মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া অজয় বলিল, “তোমার বিয়ের কথা সব শুনেছি, ওতে অবশ্য আমাদের বলবার কিছু নেই মামী—তোমার যা ভালো বিবেচনা হয়েছে তা করেছো। কিন্তু তুমি কাল এদের বউ হয়ে যে অভিনয়টা করলে মামী—উঃ, হেসে আর বাঁচিনে।”

"অভিনয়—"

কৃষ্ণা চোখ তুলিয়া অজয়ের মুখের উপর দৃষ্টি রাখিল—"অভিনয় তো আমি করিনি অজয়বাবু—"

"অভিনয় নয়—তুমি বল কি মামী? দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আমি সব দেখছিলুম। ভশ্চায গোটা কত মন্ত্র পড়ালে, তোমায় যা যা করতে বললে, লক্ষ্মী মেয়ের মত তাই করে গেলে—আবার বলছো অভিনয় করো নি—?"

অজয় কৃষ্ণার পানে চাহিল—

দৃঢ়কণ্ঠে কৃষ্ণা বলিল, "আমি অভিনয় করিনি অজয়বাবু—যা সত্য, যা প্রকৃত আমি তাই করেছি। আমি যখন এ ঘরের বউ—এ বাড়ীর গিন্নি হয়ে এসেছি—তখনই এ বাড়ীর প্রত্যেক আচার অনুষ্ঠান, ব্রত পূজা পার্ব্বণের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছি, কর্ত্তব্য হিসাবে যা কিছু সব কিছু করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছি। অভিনয় আমি করিনি অজয়বাবু, আমার কর্ত্তব্য আমি করে যাচ্ছি, আরও যা আছে তা করব।"

অজয় হাসিল, "তা ভালো মামী,—কিন্তু কথা হচ্ছে—পঁচিশ বছর যে ঘরে গৃহলক্ষ্মীর হাতের 'সন্ধ্যাদীপ' পড়েনি, আজও সেই ঘরে দীপ না দিলেও চলতে পারতো।"

কৃষ্ণা মাথা নাড়িল—"না, আমি যখন এসেছি দীপ আমায় জ্বালতেই হবে—। কেবল দীপ জ্বালানোই নয় অজয়বাবু—আর যা কিছু কর্ত্তব্য কাজ সবই করতে হবে।"

অজয় জিজ্ঞাসা করিল, "পারবেন?"

কৃষ্ণা একটু হাসিয়া বলিল, "মেয়েরা সব পারে অজয়বাবু। মেয়েরা

ভোগে যেমন অভ্যস্ত, ত্যাগেও তেমনই। তারা বিলাসে অভ্যস্ত বলেই তাদের বিলাসিনী নাম দেওয়া অন্যায়—তাদের দানটাকে আগে দেখা উচিত—"

"নিশ্চয় নিশ্চয়—"

অত্যন্ত উৎসাহে অজয় বলিল, "সে কথা এক হাজার বার, লক্ষ লক্ষ বার। আমি একদিন তোমায় আমাদের 'কাল্চারাল্ সোসাইটী'তে নিয়ে যাব মামী, দেখো আমাদের সকলেরই মত এই। অনেক মেম্বর আমাদের হয়েছে,—আরও হবে আশা করা যাচ্ছে।"

স্থিরকণ্ঠে কৃষ্ণা বলিল, "যদি এঁরা মত দেন, তা হলে নিশ্চয়ই যাব অজয়বাবু—"

অজয় বলিল, "এঁরা মানে—মামা কোনদিনই কোন বিষয়ে আপত্তি করবেন না, বরং এই সবই তিনি খুব ভালোবাসেন। তোমায় তবে সত্যকথাই বলি মামী, ওঁর আগের স্ত্রী অর্থাৎ আমার বড় মামীকে এই বার হওয়া নিয়ে অনেক নির্য্যাতনই সইতে হয়েছে। তিনি ছিলেন সে যুগের মেয়ে,—আজ বেঁচে থাকলে তাঁর বয়স অন্ততঃ পক্ষে পঞ্চাশ পঞ্চান্নের কম হতো না, এটা তো জানো—"

কৃষ্ণা নির্ব্বাকে তাহার পানে তাকাইয়া আছে দেখিয়া পরম উৎসাহে সে বলিল, "পঁচিশ কেন—পঁয়ত্রিশ চল্লিশ বছর আগেকার কথা মনে কর—যখন বড় মামী ছিলেন—পনেরো ষোল বছরের একটি গ্রামের মেয়ে,—ঘোমটা টানতেই ছিলেন অভ্যস্ত। মামা তখনকার দিনের আপ্-টু-ডেট্ ইয়ংম্যান,—ক্লাবে যাওয়া, মদ খাওয়া, সারারাত হৈ হৈ করে বেড়ানো এই ছিল তার কাজ। তখনকার দিনে স্ত্রী স্বাধীনতার

প্রথম অভ্যুদয়—আর সেই পরীক্ষা চললো ঘরে তাঁর স্ত্রীর উপরে—"

কৃষ্ণা বাধা দিল—"থাক অজয়বাবু, ওসব কথা শোনার চেয়ে আমার পক্ষে না শোনাই ভালো। গত দিনের কাহিনী শুনবার জন্যে আমি মোটেই উদগ্রীব নই, বর্ত্তমানে যেদিন এসেছে তাকে নিয়েই আমি বিব্রত। আপনার মামা দয়া করে কুঁড়ে ঘর হ'তে আমায় এনে এই ঐশ্বর্য্যের মধ্যে রাজবাড়ীতে রাণীর মর্য্যাদা দিয়েছেন, এর জন্যে আমি যে তাঁর উপর কতখানি কৃতজ্ঞ—তা আজ ভাষায় বলে বুঝাতে আমি পারিনে। আপনাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয়, সম্পর্ক গড়ে ওঠা, এ সবারই মূল তো তিনিই, এ কথা হাজার বার মানব।"

এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া সে আবার বলিল, "আর আপনারাও তো জানেন—আমার বাবা আমায় নগদ টাকা নিয়ে বিক্রী করে গেছেন; আমার সৌভাগ্য ভালো তাই আপনাদের ঘরে এসেছি, নচেৎ কোন কসাইয়ের ঘরে যেতুম—তাই বা কে জানে? টাকা নিয়ে দেওয়া ব. নেওয়া যেখানে—সেখানে যাচাই করাও চলে না।—"

অজয় অকস্মাৎ লাল হইয়া উঠিল, "থাক থাক, ও কথাগুলো বলোনা মামী, কেঁচো খুঁড়তে সাপ তুলে দরকার নেই। আচ্ছা, আজ রাত অনেক হয়েছে, তুমি শুয়ে পড়ো, কাল আবার দেখা হবে—।"

দেয়ালের ঘড়িতে তখন এগারোটা বাজিয়াছে দেখা গেল।

অজয় বাহির হইয়া গেল—

কৃষ্ণা ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।—

১৬

রমেশ গাঙ্গুলী প্রস্তাব করিয়াছেন—মাধবীকে লইয়া যাইবেন—।

তাঁহার কর্ম্মস্থল উপস্থিত বরিশাল—ছুটি শেষ হইয়া গিয়াছে।

মাধবী সুস্থ হইয়া উঠিলেও আজও তিনি বড় দুর্ব্বল। চিকিৎসক তাঁহাকে অন্যত্র লইয়া যাইবার পরামর্শ দিয়াছেন।

পত্নীর পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে রমেশবাবু বলিলেন, "অনেক দিন অনেক অবহেলা তোমায় করেছি মাধু, আজ সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই, আশা করছি তুমি নিশ্চয়ই এবার আমায় সে সুযোগ দেবে।"

মাধবী শূন্য দৃষ্টিতে স্বামীর পানে তাকাইয়া ছিলেন—মৃদু হাসির এতটুকু রেখা তাঁহার রক্তশূন্য পাণ্ডুর অধরে জাগিয়া সঙ্গে সঙ্গে মিলাইয়া গেল।—

বাঁকা সেই ক্ষণিকের হাসিটুকু রমেশবাবুর তীক্ষ্ণদৃষ্টি এড়াইল না, মুখে তিনি স্বাভাবিক থাকিলেও অন্তরে অন্তরে খানিকটা রুষ্ট হইয়া উঠিলেন।

বলিলেন, "আর ডাক্তারেরাও তোমায় এখানে থাকতে নিষেধ করছেন তা তো জানো—। এত বড় ব্যারামের পর এখানে থাকলে তোমার ম্যালেরিয়া ধরবে, তা থেকে একটা কোন শক্ত ব্যারাম হওয়া বিচিত্র নয়।"

মাধবী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বরিশালে ম্যালেরিয়া নেই ?"

রমেশবাবু উত্তর দিলেন, "গ্রামাঞ্চলে থাকলেও টাউনে কারও নেই।"

মাধবী নিস্তব্ধ রহিলেন।

রমেশবাবু বলিলেন, "কিছুদিন ওখানে গিয়ে থাকলে তোমার শরীরটা ভাল হয়ে উঠবে, মনেও শান্তি পাবে দেখে নিয়ো।"

মাধবী ধীরে ধীরে মাথা নাড়িলেন। স্বামীর অভিপ্রায় তাঁহার অজ্ঞাত নয়। রমেশবাবু খোঁজ পাইয়াছেন, অবাধ্য দুর্ব্বিনীত পুত্র এখানে আসে, মাঝে মাঝে দু' একদিন করিয়া থাকিয়াও যায়। পত্নীকে তাই তিনি এখান হইতে নিজের কাছে লইয়া গিয়া শঙ্করকে জব্দ করিতে চান, তাহাকে একেবারে তফাৎ করিতে চান।

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মাধবী বলিলেন, "ডাক্তারেরা অমন ঢের কথা বলে থাকে, তাই বলে সবই যে হাতে কলমে ফলে, তার কোন নজির পাওয়া যায় না। ডাক্তারেরা কি বলেছেন শুনি—'থাইসিস' হবে না 'টিবি' হবে, এরই কথা বুঝি তাঁরা বলেছেন ?"

বিব্রত রমেশবাবু বলিলেন, "প্রায়ই তো দেখা যায় কাজেই—"

বাধা দিয়া মাধবী বলিলেন, "এত গরীব লোকেরও অসুখ হয়—কই, তারা তো চেঞ্জে কোথাও যায় না—এখানেই ভালো হয়ে যায়। আমার অসুখ ভালো হয়ে গেছে, আর কয়েকদিন পরেই আমি উঠতে পারব, নিজের কাজ নিজেই করে নিতে পারব, সেজন্যে কাউকেই ব্যস্ত হতে হবে না।"

মর্ম্ম পীড়িত রমেশবাবু বলিলেন, "তোমার অন্যায় জেদ মাধবী, অন্যায় আবদার—একেবারেই অন্যায়। যে যাই বল আমি তোমায়

এখানে রেখে যেতে পারি নে। আমার নিজেরও কর্ত্তব্য আছে তো—"

"কর্ত্তব্য—"

মাধবী রুগ্ন দুই কনুইয়ের উপর ভর দিয়া কোন ক্রমে উঠিয়া বসিলেন—হাসির রেখা এবার স্পষ্ট হইয়াই তাঁহার মুখে ফুটিয়া উঠিল—

"কর্ত্তব্যের কথা বলছো আজ—আজ বুঝি নূতন করে কর্ত্তব্য পালনের স্পৃহা জাগলো—? যেদিন এতখানি কর্ত্তব্য না হোক—এতটুকু মাত্র তোমার কাছে পেতে চেয়েছিলুম—আজ সেদিনের কথা মনে করো। একদিন পায়ের তলায় আছড়ে পড়েছিলুম—সেদিন তোমার স্ত্রী-পুত্রের প্রতি কর্ত্তব্য পালনের কথা মনে হয়নি—কেবল সরকারী চাকরীর কর্ত্তব্যটাই মনে জেগেছিল—?"

মাধবী দুইহাত মুখে চাপা দিলেন, উত্তেজনায় দুর্ব্বল শরীর থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল।

রমেশবাবু তাঁহাকে ধরিয়া শোয়াইবার চেষ্টা করিলেন—"মিনতি করছি, শোও মাধবী—"

মাধবী মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রকৃতিস্থ হইলেন, মুখ হইতে হাত সরাইয়া বলিলেন, "না, আমি বেশ আছি, আমার কিছুই হয়নি। কর্ত্তব্য পালনের কথাটা আমার মনে বড় আঘাত দিয়েছে। যখন কর্ত্তব্য পালনের সময় ফুরিয়েছে—তখন তুমি এসে দাঁড়ালে কর্ত্তব্য পালনের জন্যে। স্ত্রীর পরে স্বামীর কর্ত্তব্য আজ তুমি পালন করবে—কিন্তু তোমার ছেলে—তাকে কোথায় ভাসিয়ে দিলে শুনি—?"

মাধবীর চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল ঝরিতে লাগিল—"আমার

একমাত্র সন্তান,—যাকে আমি আমার রক্ত মাংস দিয়ে, আমার সব দিয়ে গড়েছি—আমি তাকে প্রেরণা দিয়েছি, আমি তাকে মানুষ করেছি—আজ সে রইলো কোথায় ?”

রমেশবাবু নিস্তব্ধে খানিকক্ষণ পত্নীর পানে তাকাইয়া রহিলেন—একটা মাত্র শব্দ তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইল—“হুঁ—”

তিনি উঠিয়া খানিক ঘরের মধ্যে পাদচারণা করিলেন, তাহার পর জানালার কাছে দাঁড়াইয়া বাহিরের পানে তাকাইয়া রহিলেন।

কি হইতে গিয়া কি হইয়া গেল, তিনি নিজেই তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারেন না। মানুষের কত উচ্চ আশা থাকে—সে উপযুক্ত লেখা পড়া শিখিবে, কাজে উন্নতি করিবে—মানুষের মত মানুষ হইবে; প্রত্যেকেই চায় যশ, অর্থ, খ্যাতি—সম্মান; তিনি সবই লইয়াছেন তবু তিনি অন্তরের দিকে একেবারে দারিদ্র, মনের দিকে তাকাইয়া তিনি দেখিতে পান—এই যশ, মান, অর্থ তাঁহাকে এতটুকু শান্তি, এতটুকু তৃপ্তি দিতে পারে নাই।

যৌবনের নেশায় উন্মত্ত হইয়া তিনি ছুটিয়াছিলেন বাহিরের পানে, ঘর তাঁহার কাছে তুচ্ছ হইয়া গিয়াছিল, তাই কোন বন্ধনও তিনি মানেন নাই। চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী তিনিও জানিতেন—স্ত্রী ঘরে থাকিবে, তাঁহার সুখ সুবিধা সাচ্ছন্দের জন্য সর্ব্বদা তৎপর হইবে। মেয়েদের মনের পানে তিনি কোনদিনই তাকান নাই,—আদেশ করিয়া এবং সেই আদেশ পালন করাইয়াই তিনি সংসারের কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইতেন।

পুত্রের সম্বন্ধেও ঠিক এই ধারণা ছিল। নিজের জীবনের ধারায়

সহিত পুত্রের জীবনের ধারা তিনি মিলাইয়া ফেলিয়াছিলেন এবং নিজের লক্ষ্যে পুত্রের লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। পুত্র যে এপথ ছাড়িয়া ভিন্ন পথে চলিতে পারে, যশ, মান, অর্থ প্রভৃতির লোভ ছাড়িয়া নিঃস্বার্থে লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট করিতে পারে, এ ধারণা তিনি কোনদিনই করিতে পারেন নাই।

হঠাৎ যেদিন প্রকাশ হইয়া পড়িল—তাঁহার পুত্র রাজদ্রোহীতার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছে, হঠাৎ যে দিন তিনি জানিতে পারিলেন তাঁহার পুত্র দুঃসহ কষ্টদায়ক দেশসেবা ব্রত গ্রহণ করিয়াছে—সেদিন তাঁহার মনে হইল—পৃথিবী হইতে তাঁহার লুপ্ত হইয়া যাওয়াই দরকার ছিল।

উপরের অফিসার তাঁহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "একথা কি সত্য গাঙ্গুলী, তোমার মত লোকের ছেলে—সে রাজদ্রোহী, সে স্বদেশী ডাকাত? সে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে শত্রুতা করতে—?"

গাঙ্গুলীর মুখ কালো হইয়া গিয়াছিল, তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, "সবই সত্য হতে পারে স্যার্, অসম্ভব কিছুই নয়। আমিও জানতে পারিনি—আমার যে ছেলেকে আমি পড়বার জন্যে কলকাতায় পাঠিয়েছি, ভিতরে ভিতরে সে এত বড় কাণ্ড করে বসেছে। তবু আমার মনে হয় স্যার, সে ছেলেমানুষ, পাঁচজনের পরামর্শে এ-দলে যোগ দিয়েছে, তাকে ফেরালে আবার সে সৎ হবে।"

অফিসার গম্ভীর মুখে বলিয়া ছিলেন, তোমার ছেলে যদি রাজসাক্ষী হয় গাঙ্গুলী, সে বাঁচবে,—তা ছাড়া আমি কথা দিচ্ছি, বি, এ, পাস করলেই আমি তাকে বড় কাজ দেব।"

রমেশবাবু জেলে পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন—পুত্রকে রাজসাক্ষী রূপে পরিণত করার জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু শঙ্কর একটি উত্তরও দিল না। শেষবার কেবল মাত্র সে বলিল, "আমায় ক্ষমা করবেন, আমি আপনার আদেশ পালন করতে পারব না।"

রুদ্ধরোষে গর্জন করিয়া পিতা বলিলেন, "এর পরিণাম কি হবে জানো? আমায় পর্য্যন্ত বিপদগ্রস্ত হতে হবে, কেবল চাকরীই যাবে না, আমার বিষয়-সম্পত্তি পর্য্যন্ত যাবে।"

শঙ্কর অবিচলিত ভাবে বলিল, "কিন্তু আমি যদি আপনার সংস্রবে না যাই, আপনার চাকরী থাকবে, বিষয় সম্পত্তিও থাকবে।"

রমেশবাবু শক্তকণ্ঠে বলিলেন, "বেশ—তাই। জেনে রেখো শঙ্কর—আজ হতে তুমি আমার বা আমার পরিবারের কেউ নও। ভবিষ্যতে আমার নামে তুমি পরিচয় দেবে না—এবং আমিও তোমায় এই মুহূর্ত্তে ত্যাজ্যপুত্র করলুম।"

শঙ্কর মুখ তুলিল, একটি মাত্র কথা তাহার মুখে ফুটিল—"কিন্তু আমার মা—"

রমেশবাবু বলিলেন, "তারও আগে মনে করো—সে আমার স্ত্রী. আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি আমার আদেশে তাকে চলতে হবে এবং আমার আদেশে তাকে পুত্রের সংস্রবও ত্যাগ করতে হবে।"

শঙ্কর কেবল দুই হাতে মুখ ঢাকিয়াছিল—আর একটি কথা তাহার মুখে শুনিবার আগেই রমেশবাবু বাহির হইয়া গেলেন।

সে আজ কতদিনের কথা,—তাহার পর কয়টা বৎসর চলিয়া গেছে।

পুত্রকে ত্যাজ্যপুত্র করিয়া কেবল তাহার কৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্যই রমেশবাবু রাজভক্তির মাত্রা বাড়াইয়া দিয়াছেন।

কিন্তু ভুল তিনি করিয়াছেন—সে ভুল মাধবীর সম্বন্ধে। স্ত্রী তাঁহার —কিন্তু তিনি শঙ্করের মা। স্ত্রী স্বামীর প্রতি নিঃশব্দে কর্ত্তব্য পালন করিয়া যায়, দুর্ভাগিনী মা অন্তরের আড়ালে গুমরিয়া কাঁদে।

জব্দ কাহাকেও করা যায় নাই। রমেশবাবু না থাকিলে শঙ্কর মায়ের কাছে আসে, এমন কি দু'একদিন থাকিয়াও যায়। তখন কোথায় থাকে দুর্দ্দান্ত স্বামী, শক্তিশালী পিতা—থাকে শুধু মা ও ছেলে।

পিছন ফিরিয়া রমেশবাবু দেখিলেন—কাঁদিতে কাঁদিতে মাধবী কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন।

১৭

নিঃশব্দে পা টিপিয়া টিপিয়া আসে শঙ্কর—

দিন পনেরো আগে সে মাকে দেখিয়া গিয়াছে—একটু সুস্থ দেখিয়া সে কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া গিয়াছিল।—

কোর্টে মামলার শেষ হইয়া গিয়াছে,—শঙ্কর হাজির হইয়াছিল, নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন হইয়া সে মুক্তি পাইয়াছে। ছেলেরা জয়ধ্বনি করিয়া তাহাকে মালা পরাইয়া দিয়াছে, তাহাকে লইয়া ঘুরিয়াছে—।

শঙ্কর সসম্মানে আসিয়াছে।

তবু বাড়ীতে সে প্রবেশ করিতে পারে না, চোরের মত নিঃশব্দে বাড়ীতে প্রবেশ করিতে হয়।

এই বাড়ীতে আছেন তাহার মা,—অশোক বনে সীতার মত তাঁহার অবস্থা। পিতা নিরন্তর তাঁহাকে পাহারা দিতেছেন, দুর্ব্বিনীত অবাধ্য পুত্রের এ বাড়ীতে প্রবেশ করিবার অধিকার নাই।

শঙ্কর দরজার কাছে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল—বাড়ীতে তাহার মা আছেন তো? পিতার কাল চলিয়া যাইবার কথা, তিনি যাইবার সময় মাকে হয়তো সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন।

এক পক্ষে খুব ভালো—মা বাঁচিবেন। কয়েক দিন আগে শঙ্করও বলিয়াছিল—এখানে থাকিলে মা কোনদিন ভালো হইবেন না, তাঁহার এখন অন্যত্র যাওয়া দরকার।

মা যাইতে চান না;—কেন চান না তাহা শঙ্কর জানে। মা জানেন শঙ্কর এখানে যেমন করিয়াই হোক আসিবেই—পিতা যেখানে আছেন সেখানে সে যাইবে না, ফলে তিনি পুত্রের মুখ আর দেখিতে পাইবেন না। দীর্ঘদিন তিনি এখানে আছেন, পিতা তাঁহাকে লইয়া যাইতে পারেন নাই।

দরজা ভিতর হইতে বন্ধ—কিন্তু তাহাতে শঙ্করের কিছু আসে যায় না। অবলীলাক্রমে সে পাঁচিল টপ্‌কাইয়া ভিতরে নামিল। বারাণ্ডায় শায়িত কুকুরটা একবার চীৎকার করিয়া কাছে ছুটিয়া আসিল, শঙ্করকে চিনিয়া সে আর একটীও শব্দ না করিয়া তাহার পায়ে মাথা ঘষিতে লাগিল।

অবোধ জন্তু—সেও মনিব চেনে—

কয়েক বৎসর আগে এতটুকু বাচ্চা জিমকে আনিয়া শঙ্কর মায়ের

কাছে দিয়াছিল। মা জিমকে পরম যত্নে প্রতিপালন করিয়াছেন— আজও জিমকে তিনি বড় ভালোবাসেন।

"জিম জিম—"

পিতার কণ্ঠস্বর শোনা গেল—

শঙ্কর নিস্তব্ধে দাঁড়াইল, আর একপাও সে অগ্রসর হইতে পারিল না।

পিতা আজও যান নাই—কিন্তু গত কালই যে তাঁহার যাওয়ার কথা ছিল—।

সামনের ঘরের দরজাটা খুলিতেই ঘরের আলো বাহিরে ছড়াইয়া পড়িল—দরজার উপর দাঁড়াইলেন শঙ্করের পিতা রমেশ গাঙ্গুলী—

"কে ও, কে ওখানে দাঁড়িয়ে—?"

পিতার প্রশ্নের উত্তর শঙ্কর দিল না, এক পা সরিল না।—

রুক্ষকণ্ঠে রমেশবাবু বলিল, "কে ওখানে উত্তর দাও—নচেৎ গুলি করব।"

ধীরকণ্ঠে শঙ্কর উত্তর দিল—আমি—"

রমেশবাবু বলিলেন, "আমি তো সবাই, সামনে এসো—"

পায়ে পায়ে শঙ্কর আগাইয়া আসিল। রমেশবাবুর হাতের টর্চের আলো উজ্জ্বলভাবে শঙ্করের মুখের উপর ছড়াইয়া পড়িল।

"তুমি—তুমি আবার এসেছো এ বাড়ীতে—কেন—কোন অধিকারে এসেছো আমি শুনতে চাই—।"

শঙ্কর উত্তর দিল না।

মাটিতে পদাঘাত করিয়া রমেশবাবু বলিলেন—"বল—আমার কথার উত্তর দাও। আমি তোমায় ত্যাজ্যপুত্র করেছি, আমার একটী পয়সাও

আমি তোমায় দেব না, এ ভিটেয় পা দেওয়ার অধিকার আর তোমার নেই—এ কথা তুমি জান।"

শঙ্কর উত্তর দিল,—"জানি—"

রমেশবাবু রুক্ষকণ্ঠে বলিলেন, "জানো—তবু তুমি এসেছো? আমার আদেশে তোমায় এই মুহূর্ত্তে চলে যেতে হবে।"

শঙ্কর কেবল মাত্র বলিল, "না—"

রমেশবাবু হঠাৎ যেন থতমত খাইয়া গেলেন, "না কেন—?"

স্থিরকণ্ঠে শঙ্কর বলিল, "আপনার যদি বুঝবার শক্তি থাকতো—আমায় জিজ্ঞাসা করতেন না। আমার মা যেখানে থাকবেন আমি নিশ্চয়ই সেখানে যাব, আপনার আদেশই হোক আর ভয় দেখানোই হোক—আমায় বাধা দিতে পারবেন না।"

"তোমার মা—"

দাঁতের উপর দাঁত রাখিয়া পিতা গর্জন করিলেন, "তারও আগে মনে করো—তোমার মা আমার স্ত্রী,—স্বামীর আদেশে তিনি তোমায় ত্যাগ করতে বাধ্য—

শঙ্কর একটু হাসিল, বলিল, "ভুল করছেন—জোর করে কেউ স্বামীত্ব নিতে পারে না। আমি জানি—আমি প্রমাণ দেব—মা ছেলের মাঝখানে স্বামীর স্থান নেই। আমার মা কেবল আমার মা; আমার জন্যে তিনি সবই ত্যাগ করতে পারেন—এমন কি আপনাকেও। আপনি ভুল করবেন না—জোর করে বর্ত্তমান যুগে সেকালের আদর্শ বজায় রাখতে যাবেন না—সাইকোলজির দিক দিয়ে বিচার কর্ত্তে গেলে পরাজয়, আপনারই ঘটবে—একথা ঠিক জেনে রাখবেন।"

এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া সে বলিল, "তারপর আপনি আমায় এখান হতে চলে যেতে আদেশ করছেন—কিন্তু জানেন এখান হতে আমায় তাড়ানোর অধিকার আপনারও নেই, কারণ আপনার পিতৃপুরুষের ভিটে আপনি যেখানে নিজের অবাধ কর্ত্তৃত্ব দেখিয়ে যাচ্ছেন, সেখানে সেই পূর্ব্ব পুরুষের ভিটের দাবী আমি নিজেও করতে পারি এবং করবও। আপনি যেখানে যে দাবী নিয়ে আমায় আদেশ করতে পারেন, আমি সেখানে সেই দাবী নিয়ে আপনাকে অনুরোধ করতে পারি যে—"

আত্মবিস্মৃত রমেশবাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"আমি তোমায় গুলি করব, তোমায় খুন করব ষ্টুপিড—"

ভিতরের ঘরে নিদ্রিতা মাধবীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল—কাঁপিতে কাঁপিতে তিনি উঠিয়া বসিলেন—

শঙ্কর আসিয়াছে—

"শঙ্কর—শঙ্কর—"

দুই পা মাত্র চলিয়াই মাধবী থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া পড়িয়া গেলেন—

ধড়াস্ শব্দটা কানে আসিবামাত্র শঙ্কর দ্রুত বারাণ্ডায় উঠিয়া পড়িল, পিতাকে অতিক্রম করিয়া ঘরে প্রবেশ করিবার মুখেই দেখা গেল, মাধবী মূর্চ্ছিতাবস্থায় পড়িয়া—তাঁহার নাক মুখ দিয়া খানিকটা রক্ত বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

"মা—মাগো, ওমা—"

শঙ্কর বার বার ডাকিতেছিল—মায়ের মাথা নিজের কোলে তুলিয়া সে পাখাটা দিয়া বাতাস করিতে লাগিল—

স্তম্ভিত রমেশবাবু দরজার উপর দাঁড়াইয়া ছিলেন,—তাঁহার চোখে তখন পলক পড়ে নাই।

১৮

দিনের পর দিনও কাটিয়া যায়—কৃষ্ণার দিনও সুখ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে কাটিতেছে।

মামাবাবু চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছেন এ-খবর সে পাইয়াছে। কোথায় আছেন তাহা সে জানে না, জানিলে একবার খবর দিত—একবার দেখা করিবার চেষ্টাও করিত।

আচম্‌কা ঝড়ের মত আসিয়া পড়ে অজয়—ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে।

"আচ্ছা নতুন মামী, কি দরকার তোমার বাপু এই সব সংসার নিয়ে,—চল ফিল্‌ম দেখতে যাওয়া যাক—না হয় আমাদের ক্লাবে চল।"

মা সুরবালা বাধা দেন—"কোথায় যাবে ক্লাবে—বায়স্কোপ থিয়েটারে বরং পাঁচজনের মধ্যে একজন হয়ে যেতে পারে বন্ধু নিয়ে, ঘরের বউ ক্লাবে যাবে কি ?"

অজয় বলে, "তুমি সেই সেকালের যুগে পড়ে আছ মা, আজকাল-কার আবহাওয়া যা বইছে তাতো জানো ? বনের পাখীটাকে এনে খাঁচায় পুরেছো, বাইরের রোদ হাওয়া না পেলে ও-যে মরে যাবে।"

মা সন্দিগ্ধভাবে বলেন, "হ্যাঁ, মরে যাবে—তোর সে মামী ঘরেই থাকতে চাইতো, তাকে বার করার জন্যেই না—"

বলিতে বলিতে তিনি চুপ করিয়া যান—।

খুঁচাইয়া ঘা বাহির করিতে তিনি চান না কৃষ্ণ তাহা বুঝে, সে মৃদু হাসিয়া চলিয়া যায়।

রায় বাহাদুরের প্রথমা স্ত্রী আত্মহত্যা করিয়াছিলেন।

অসম্ভব নয়!

তাঁহার জীবনে বাহিরের সঙ্গে কোন সম্পর্কই ছিল না, অন্দর লইয়াই ছিল তাঁহার কারবার। স্বামী যখন বাহিরের আলো হাওয়ায় তাঁহাকে টানিয়া বাহির করিতে চাহিলেন, তখন তাঁহার বয়স যথেষ্ট—দীর্ঘকাল অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকিয়া তিনি বাহিরে আসিতে চাহেন নাই।

এক রকম প্রায় টানিয়াই তাঁহাকে বাহির করিতে হইয়াছিল।

ইহাতে ফল হইল বিপরীত।

অন্তঃপুরে থাকিয়া স্বামীর স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে সব জানিয়াও তিনি চোখ মুদিয়া থাকিতেন, বাহিরে আসিয়া সেই পরম সত্য যখন তাঁহার চোখে স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তখন তিনি একমাত্র সহায় সুরবালার কাছে গিয়া কাঁদিয়া পড়িয়াছিলেন।

ইহারই মধ্যে কন্যা বড় হইয়া উঠিয়াছিল এবং স্বেচ্ছামত বিবাহ করিয়াছিল।

স্বামীর চরিত্র হীনতা এবং কন্যার স্বেচ্ছাচারিতা দুর্ভাগিনী নারীর সকল দৃঢ়তা নষ্ট করিয়া দিয়াছিল, আর সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিয়া সকল জ্বালা জুড়াইয়াছিলেন।

সেইদিন সেই সুরবালা এ-বাড়ীতে আসিয়াছিলেন, দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর পরে কৃষ্ণা আসার পর তিনি ধনী ভাইয়ের বাড়ী আসিয়াছেন।

কত দুঃখে কত কষ্টে দিন কাটিয়া গিয়াছে, ভাইয়ের কাছে কোন দিন তিনি তাহা জানান নাই। অজয় সম্বন্ধে তাহার মামার একটু ঔৎসুক্য ছিল, সেইজন্যই তিনি তাঁহার পড়ার ভার লইয়া ছিলেন। অজয় কলিকাতা ইউনিভার্সিটী হইতে বি,-এ, ডিগ্রি লইয়া বিলাতে গিয়া ডাক্তারী পড়িয়াছে এবং স-সম্মানে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়াছে।

পঁচিশ বৎসরের মধ্যে অবশ্য রায় বাহাদুরের বাড়ী নারী-হীন ছিল না—এ কথা সত্য। কন্যা সুলেখা ইহার মধ্যে অনেকবার আসা যাওয়া করিয়াছেন—পিতার নিকট হইতে মাসিক একটা সাহায্যও ঠিক করিয়া লইয়াছেন।

সুলেখার একমাত্র কন্যা ইরা—সহরের অভিজাত মহলে বিশেষ খ্যাত। তাহার সৌন্দর্য্য গান ও নৃত্যে সে বিশিষ্ট স্থান লইয়াছে—স্কটিশে সে থার্ড ইয়ারে পড়ে—।

সুলেখা কন্যাকে লইয়া চৌরঙ্গীতে থাকেন—স্বামী বহুকাল আগে বিলাতে গিয়া আর ফিরিয়া আসেন নাই। এতকাল তাঁহার সম্বন্ধে কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই, বর্ত্তমানে রায় বাহাদুর সংবাদ পাইয়াছেন তাঁহার জামাতা পুলিন মৈত্র ইউরোপের যুদ্ধে যোগ দিয়াছেন এবং লেফটেন্যাণ্টের পোষ্টে আছেন।

সেদিন তাঁহার আনন্দের শেষ নাই,—অজয় আসিতেই সংবাদ

দিলেন, "জানো অজয়, আমাদের পুলিন—আমার জামাই—সে বেঁচে আছে, যুদ্ধ বিভাগে বেশ বড় কাজ করছে।"

অজয় একটু হাসিল—বিলাতে থাকিতে পুলিন মৈত্রকে সে চিনিত, তাঁহার সবিশেষ পরিচয়ও সে পাইয়াছিল।

রায় বাহাদুর এ খবরটা তখনই ফোনে কন্যাকে জানাইয়া দিলেন—। কৃষ্ণা আসা পর্য্যন্ত সুলেখা এ-বাড়ীতে আসেন নাই দীর্ঘদিন পরে কন্যা-সহ সুলেখা সেদিন সন্ধ্যার আগে পিত্রালয়ে পদার্পণ করিলেন।

রায় বাহাদুর তখন কেবল সান্ধ্যভ্রমণে যাইবার উদ্যোগ করিতে-ছিলেন, সুলেখার গাড়ীখানা গাড়ী-বারাণ্ডার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল—

মায়ের আগেই নামিয়া পড়িল ইরা—

সুন্দরী ইরা—অতি ফ্যাসান দুরন্ত মেয়ে। নিত্যতার নূতন ষ্টাইল, তাহার নিত্যকার অভিনব ষ্টাইল অন্য মেয়েদের পীড়া দেয়—ঈর্ষান্বিতা করে।

"বড় অসময়ে এসে পড়েছি আমরা দাদু—আপনি বার হচ্ছিলেন এমন সময় আমরা এসে বাধা দিলুম—"

বলিতে বলিতে ইরা মুখ টিপিয়া হাসিল—"দাদু নিশ্চয়ই কোন পার্টিতে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন মা—"

চঞ্চলা মেয়েকে ধমক দিয়া সুলেখা বলিলেন, "থাক থাক, তোকে আর বেশী পাকামী করতে হবে না ইরা—ভারি কথা বলতে শিখেছিস—দাদুর সঙ্গে কেবল তামাসা—"

সস্নেহে রায় বাহাদুর বলিলেন, "করুক, করুক,—আমার সঙ্গে

তামাসারই সম্পর্ক তো—। এসো সুলেখা—বসবে, তোমার সঙ্গে কথা আছে।”

কন্যা ও দৌহিত্রীকে টেবিলের ধারে বসিতে বলিয়া রায় বাহাদুর বসিলেন—

“হ্যাঁ, যে কথাটা তখন ফোনে বলছিলুম—খবর পেলুম পুলিন বেঁচে আছে, এই জার্ম্মান যুদ্ধে সে·লেকটেন্যান্টের কাজে ছিল। শুনলুম—যুদ্ধ মিটে যাওয়ার পরই সে ফিরে আসবে—

যুদ্ধও আর বেশীদিন নয়—শুনছি দু' এক মাসের মধ্যেই মিটবে।”

ইরা বলিল, “জার্ম্মানীর যুদ্ধ মিটলেও জাপানের যুদ্ধ যে সহজে মিটবে দাদু, তা তো মনে হয় না। সেদিনকার কাগজে পড়েছেন তো—ওরা আবার ইম্ফল পর্য্যন্ত দখল করেছে।”

চিন্তিত মুখে রায় বাহাদুর বলিলেন, “হ্যাঁ, এদিকে আসামের সীমান্তে এসে পৌঁচেছে শুনছি। কলকাতার বেশীর ভাগ লোক বম্বিংয়ের ভয়ে যেমন পালিয়েছে—ওদিকে আবার আসাম পূর্ব্ববঙ্গ হতে লোক আসতেও সুরু করেছে। নাঃ, এরা আর টিকতে দেবে না দেখছি।”

তিনি মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন—

ইরা বলিল, “কিন্তু আপনার তো কোন ভয় নেই দাদু, চাকরী তো করতে যান না—তবে পেনশানটা যদি যায়—সে একটা ভাবনার কথা বটে—”

মা আবার ধমক দিলেন, “কি বকছিস ইরা ও-রকম যা তা কথা বলিস যদি—”

ইরা উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "তোমরা ততক্ষণ কথাবার্ত্তা বল মা, আমি বরং বাইরে ততক্ষণ বেড়াই। তাড়াতাড়ি কথাবার্ত্তা শেষ করে নিয়ো—যা ব্ল্যাক-আউটের সময়—এর পর বাড়ী পৌঁছানো মুস্কিল হবে।"

সে বাহির হইয়া গেল—

সামনের লনে অজয় দাঁড়াইয়াছিল—ইরা তাহাকে দেখিয়াই বাহির হইল—

হাসি মুখে অজয় বলিল, "কি বলব বলতো ভাগনী,—ইংরাজিতে জানাব না বাংলায়—?"

ইরা জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলতে চান আগে সেইটুকুই বলুন তবে তো বলব।"

অজয় বিপন্নের মত মুখের ভাব করিয়া বলিল,—"আঃ, ওই যে—সুপ্রভাত না সুসন্ধ্যা—কোনটা বলব আর কোন ভাষায় বলব সেইটাই বলতে বলছি।"

ইরা তর্জ্জনী তুলিয়া শাসনের সুরে বলিল, "খবরদার অজু মামা, ওর একটাও না—ভাষার সংস্কৃতিও নয়, অসংস্কৃত মাতৃ-ভাষাতেই আলাপ হোক। যাক, বহুকাল পরে দেখা কিন্তু,—বিলেত হতে ফিরে চতুর্ভুজ হয়েছেন নিশ্চয়, তাই দেখাটা পর্য্যন্ত করেন নি।"

গম্ভীর ভাবে নিজের হাত দু'খানা সামনের দিকে মেলিয়া দিয়া অজয় বলিল, "দেখতেই পাচ্ছো—সামান্য দ্বিভুজ মাত্র, চতুর্ভুজ হলে তোমাদের নরলোকে যে থাকতুম না সেটা অনুভবেই বুঝছো। যাই হোক—তোমায় দেখেই দাঁড়িয়েছি—তার পর, আজ হঠাৎ এ-বাড়ীতে? যতদূর শুনলুম তাতে জানি আজ মাস দুই তিনের মধ্যে তোমরা নাকি এ-বাড়ীর

ছায়াও মাড়াও নি। জিজ্ঞাসা করি আজ হঠাৎ মাতা কন্যার এ-বাড়ীতে আগমনের উদ্দেশ্য কি, হারানো পুলিন মৈত্রের সন্ধানে না আর কিছু?"

ইরা বলিল, "আপনার বাঁকা কথা আজও সোজা হল না অজু মামা,—এত বছর পরেও ঠিক সেই ধারাটী বজায় আছে?"

গম্ভীর মুখে অজয় বলিল, "মানুষটাই যে সোজা নয় ভাগনী, কাজেই তার সবই বাঁকা। যাই হোক বাড়ীর ভেতর যাবে কি, না এখান হতেই ফিরবে?"

ইরা বলিল, "আজ নয় অজু মামা—আজ একটা পার্টিতে চলেছি, দু' একদিন পরে আসব। মা অবশ্য আসবেন না, তবে আমি একবার নূতন গিন্নির সঙ্গে আলাপটা করে যাব—ইচ্ছে আছে। আপনি ফিরেছেন, আজ মাস দুই তিন হবে—না অজু মামা, এর মধ্যে একবার তো দেখা করতে গেলেন না—?"

অজয় বলিল, "বোন বা ভাগনীরও কি উচিত ছিল না—যে মানুষটা এত কাল বিদেশে কাটিয়ে এলো, তাকে কাছে ডাকা বা তার বাড়ী যাওয়া; না ডাকতে কি করে যাই বল? থাকি তো একেবারে বাঙ্গালী পাড়ায়—শ্যামবাজারে, চৌরঙ্গীর মত জায়গায় তোমাদের বাড়ী না ডাকতে যাওয়া যায় কখনও? অতখানি সাহস আমার নেই—শেষে অপমানিত হয়ে ফিরব?"

ইরা রাগ করিয়া মুখ ফিরাইল।

১৯

ঠাকুর ঘরে সন্ধ্যাদীপ দিয়া কৃষ্ণা গলায় অঞ্চল জড়াইয়া প্রণাম করিতেছিল—

কোন দিন সে প্রার্থনা করে নাই—এমন ভাবে সন্ধ্যাদীপ দেয় নাই। প্রথমটায় গৃহিণীর এ কর্ত্তব্য পালন করিতে তাহার অন্তর বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল—তাহার পরই মনে পড়িয়া গেল সে ক্রীতদাসী মাত্র, মনিব বাড়ীতে মনিবের মনস্তুষ্টি সাধনই তাহার এক মাত্র কাজ —তাহার কর্ত্তব্য।

এই কর্ত্তব্য পালন করিতে গিয়া কখন যে আনুরক্তি আসিয়া গিয়াছে, নিষ্ঠা আসিয়া পড়িয়াছে তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারে না। ভণ্ডামী করিতে গিয়া একজন যে যথার্থ সাধু হইয়া গিয়াছিল—কথাটা মিথ্যা নয় —কৃষ্ণার জীবনে ইহা প্রত্যক্ষ সত্য।

মিথ্যাই সে এটা-ওটা নাড়িয়াছে, শান্তির আশায় ছুটাছুটি করিয়াছে, শান্তি সে পায় নাই। কিছুতে সে নির্ভর করিতে পারে নাই—নির্ভর করিয়া শান্তি পাইয়াছে এই গৃহ-দেবতার উপর।

আজ সে বার বার মাথা নোয়াইতেছে—"আমায় কর্ত্তব্যে অবিচল রাখো, আমায় এই অশান্তির মধ্যেও শান্তি পেতে দাও,—আমি যেন নিজেকে হারিয়ে না ফেলি—"

যখন তাহার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়—সে এই ঘরে ছুটিয়া আসে, দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া সে মাটিতে লুটাইয়া পড়ে।

রুদ্ধ দরজার বাহিরে ডাক শোনা যায়—নতূন মা—সাহেব ডাকছেন—"

কৃষ্ণা মুখ তুলিল—

দাসী আবার ডাকিতেছে—"নতূন মা—"

বিরক্তি পূর্ণ কণ্ঠে কৃষ্ণা বলিল, "বল গিয়ে আমি আসছি—।"

খানিক পরে দরজা খুলিয়া সে বাহির হইল।

রায় বাহাদুর এমন সময় কোনদিনই বাড়ীতে থাকেন না, আজ এমন সময়ে বাড়ী থাকা একেবারেই আশ্চর্য্য।

বারাণ্ডায় দেখা গেল সম্পর্কীয়া একটী মেয়েকে—সম্ভব সে প্রণাম করিতে আসিয়াছিল, দরজা বন্ধ দেখিয়া ফিরিয়া যাইতেছে।

কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করিল, "কে আমায় ডাকছিল সুহাস—?"

সুহাস উত্তর দিল, "তোমার ঝি ডাকছিল ছোট কাকী—কাকাবাবু নাকি তোমায় ডেকে পাঠিয়েছন।"

দাসীকে দেখা গেল—সে কৃষ্ণার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়াছিল। বলিল, "সাহেব বৈঠকখানায় আছেন মা, আপনাকে সেখানে যেতে বলেছেন।"

এক মুহূর্ত্তে কৃষ্ণার মন তিক্ত হইয়া উঠিল--আজ কয়েকমাস সে এখানে আসিয়া কোনদিনই বৈঠকখানায় যায় নাই। বৈঠকখানার ও অন্তঃপুরের মধ্যে রীতিমত ব্যবধান আগেও যেমন ছিল, এখনও সে তেমনি রাখিয়া চলিয়াছে। অজয় কয়েকদিন তাহাকে বাহিরে টানিবার চেষ্টা করিয়াও পারে নাই—আজ তাহাকে বৈঠকখানায়

যাইতে হইবে শুনিয়া সে মাথা নাড়িল। চলিতে চলিতে থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "বৈঠকখানায় কে কে আছে জানো কমলা ?"

কমলা উত্তর দিল, "দিদিমণি এসেছেন আর তাঁর মেয়ে এসেছেন—"

"দিদিমণি আর তাঁর মেয়ে—ওঃ—"

কৃষ্ণার মুখখানা বিকৃত হইয়া উঠিল।

রায় বাহাদুরের কন্যা সুলেখা এবং তাঁহার কন্যা ইরার কথা সে শুনিয়াছে। সেইদিনই একজন আত্মীয়া সদুঃখে তাহাকে শুনাইয়া বলিয়াছিলেন, "মেয়েটা তবু আসতো—বউ এসে পর্য্যন্ত বাড়ীর ছায়া আর মাড়ালো না। কি করেই বা জানবে বলো—বাপ এই তিনকাল গিয়ে বিয়ে করবেন ?"

আর একজন ভ্রূভঙ্গি করিয়া বলিয়াছিলেন, "একে আর বিয়ে বলো না দিদি, বিয়ের নামে আর ঘেন্না ধরিয়ো না,—এতো পয়সা দিয়ে কিনে আনা—সুলেখার এতে রাগ দুঃখ করা উচিত নয়। বিয়ে হয় সমান-সমান ঘরে—কার মেয়ে—কি জাত কোন ঠিক নেই,—দেখলে না—নগদ টাকা নিয়ে ঘরে মেয়ে তুলে দিয়ে গেল।"

সে অপমান নীরবে কৃষ্ণা সহিয়াছে,—একটী কথা সে বলে নাই।

গম্ভীর প্রকৃতি স্বামীর সহিত তাহার খুব কমই বাক্যালাপ হয়। সুলেখার সম্বন্ধে সে অজয়ের কাছে খোঁজ করিয়াছিল—জানিয়াছিল সুলেখা একদিন বাহির হইতে আসিয়া চলিয়া গিয়াছেন। ভিতর বাড়ীতে তিনি কোনদিনই প্রবেশ করেন নাই, এই সব আত্মীয়-আত্মীয়াদের তিনি চিরদিন পরিহার করিয়াই চলিয়াছেন।

একদিন সে সুলেখাকে দেখার ইচ্ছা স্বামীর নিকট প্রকাশ করিয়াছিল, সঙ্কুচিত ভাবে বলিয়াছিল, "তাঁকে একবার এ-বাড়ীতে আসতে বললে, আমি একবার দেখা করতে পারি।"

রায় বাহাদুর গম্ভীর ভাবে কেবল একটা "হুঁ" দিয়াছিলেন। ইহার পর সাহস করিয়া কৃষ্ণা এই গম্ভীর প্রকৃতি স্বামীকে আর কোন কথা বলে নাই।

আজ সুলেখা আসিয়াছেন—রায় বাহাদুর তাই কৃষ্ণাকে বৈঠকখানায় ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন।

কৃষ্ণা ফিরিল, দাসীকে বলিল, "তুমি বল গিয়ে আমি ঠাকুর ঘরে আছি, আমার কাজ সারা না হলে যেতে পারব না।"

সে আবার ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিল।

বিস্মিত দাসী খানিক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া অগত্যা বৈঠকখানায় গিয়া জানাইল—মা পূজার ঘরে আছেন—এখন আসতে পারবেন না।

"আসতে পারবে না—মানে—?"

রায় বাহাদুর সোজা হইয়া বসিলেন।

সুলেখা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "এ-বউও ঠাকুর ঘর সার করেছে দেখছি বাবা,—আবার বুঝি লক্ষ্মী পূজো, সত্যনারায়ণের পাঁচালী সুরু হয়েছে?"

রায় বাহাদুর আরক্ত মুখে বলিলেন, "এ সব সুরবালার কাণ্ড সুলেখা, সে এখানে থেকে এই সব করে গেছে, তা আমি জানতুম না।"

ইরা একখানা বইয়ের পাতা উল্টাইতেছিল, মুখ তুলিয়া বলিল,

"এখন তো জানলেম, কিন্তু এর পরে কি করবেন দাদু, তাঁর উপর নির্য্যাতন—?"

মাতা ধমকের সুরে ডাকিলেন, "ইরা—"

ইরা দাদুর আরক্ত মুখের পানে তাকাইয়া বিনীত কণ্ঠে বলিল, "যদি আমি অন্যায় বলে থাকি দাদু, আপনি তা মাপ করবেন। অন্যায় আমি নিজে কোনদিন সইতে পারিনে, অন্য কেউ-ও যে অন্যায় মেনে নেবে, সেটা আমার বাঞ্ছনীয় নয়।

এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া সে বলিল, "ভুল সবাই করে, ভুল আপনিও করেছেন দাদু,—জীবনের শেষ সীমায় দাঁড়িয়ে আপনি একটী ছোট মেয়েকে জীবনের সহচারিণী করেছেন, এ ভুল আপনি কোনদিন সংশোধন করতে পারবেন না—। তবু যদি পারেন আর ভুলের পথে না চলে বরং সোজা সত্য পথে চলুন, যে পাপ করেছেন সেই পাপের কতকটা প্রায়শ্চিত্ত করুন। সে মেয়েটিকে সুখী আপনি কোনদিন করতে পারবেন না, তবু কতকটা তাঁকে শান্তিতে থাকতে দিন।"

রায় বাহাদুর নীরবে দৌহিত্রীর কথা শুনিয়া গেলেন কিন্তু কন্যার স্পষ্ট-বাদীতায় সুলেখা শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। পিতার স্বভাব তিনি জানিতেন—হয়তো এই মুহূর্ত্তে তাঁহাদের সহিত সম্পর্ক রহিত করিবেন—সুলেখার যাবতীয় খরচ বন্ধ করিয়া দিবেন।

আরও একদিন ইরা বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিবার উদ্যোগ করিয়াছিল মাত্র, তিনি কোন রকমে তাহাকে সরাইয়া দিয়াছিলেন। এই স্পষ্ট-বাদিনী মেয়েটীকে তিনি এখানে আনিতে চান না, সে জোর করিয়া আসে।

রায় বাহাদুর মুখ তুলিলেন—

"হুঁ,—আমি সবই শুনলুম ইরা, সব কিছুই বিবেচনা করা যাবে। তবে সুলেখা—আমি তোমায় কথা দিচ্ছি সামনের হপ্তায় যে-কোন দিন আমি কৃষ্ণাকে নিয়ে তোমার ওখানে যাব।—"

আবার কি কথা বলিতে ইরা কি বলিয়া বসিবে—এই ভয়ে সুলেখা তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলেন—

"আজ যাচ্ছি বাবা, তুমি তা হলে নতুন বউকে নিয়ে একদিন এসো—আমি প্রতীক্ষায় থাকব—"

ইরা উঠিতে চায় না—"আর একটু বসো না মা, এখনি যাওয়ার তো কোন দরকার নেই। কাল রবিবার আছে, কলেজ নেই, আজ খানিকটা বসা চলে—"

মা বলিলেন, "নাই বা থাকলো কলেজ, পড়া শুনাতো করতে হবে—ওঠ্।"

মাতা পুত্রী বিদায় লইলেন।

২০

গম্ভীর কণ্ঠে রায় বাহাদুর ডাকিলেন—"শোন, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।"

কথা যে কি তাহা কৃষ্ণা জানে, সে প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছে। একটি কথাও না বলিয়া সে টেবলের ধারে দাঁড়াইল।

রায় বাহাদুর বলিলেন, "তুমি আজ আমায় কতখানি হেয় করেছো, সেটা ধারণা করতে পেরেছো?"

কৃষ্ণা নীরবে রহিল।

রায় বাহাদুর ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "আঁস্তাকুড়ের পাত যে কোনদিন স্বর্গে যায় না—এ কথা আগে বিশ্বাস না করলেও আজ বিশ্বাস করছি। তুমি জানো—একদিন তোমার বাবা—"

কৃষ্ণা মুখ তুলিল, কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "তাঁর কথা আমায় বলবেন না—"

রায় বাহাদুর দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, "কিন্তু ওই কথাটাই আমি বলতে চাই কৃষ্ণা। তুমি জানো—তোমার আমার মধ্যে বয়সের পার্থক্য অনেকখানি, আমার দৌহিত্রী ইরা হয়তো তোমার চেয়ে দুই এক বছরের বড় হবে ছাড়া ছোট নয়। পঁচিশ বছর বিপত্নীক জীবন আমি কাটিয়ে এসেছি, আজ এই শূন্য ঘরে তোমায় প্রতিষ্ঠিত করার কোন দরকার

আমার ছিল না; আমার এই শেষ জীবনে শান্তিলাভ করতে আমি তোমায় আনিনি। তোমার বাবা আমার পা জড়িয়ে ধরে আমার হাতে তোমায় তুলে দিয়েছেন—পরিবর্ত্তে তিনি শুধু একবারই যে অনেক টাকা নিয়ে গেছেন তা নয়, মাঝে মাঝে এখনও পত্র দেন টাকা পাঠাবার জন্যে—"

অধীর ভাবে কৃষ্ণা বলিল, "টাকার বিনিময়ে আমায় না নিয়ে আর কিছু নিলেও তো পারতেন—"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "না, দুর্ব্বলতা একটু এসেছিল, ভেবেছিলুম —যাক, আমার সে ভাবনা আমার মনেই থাক। আমি তোমায় একটা সত্য কথা জানিয়ে রাখছি—আমি তোমার যে সম্মান দিয়েছি—সে সম্মান তুমি অটুট্ রাখবে, যে ঘরে তুমি এসেছো, সে ঘরের মর্য্যাদা হানি যেন তোমার দ্বারা না হয়।"

কৃষ্ণা নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল,—

রায় বাহাদুর বলিলেন, "তোমায় যে আমি বিয়ে করেছি—এজন্য তোমার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। শুনেছি তুমি নিজেই বলেছো—তোমার বাবা টাকা নিয়ে যে কোন লোকের হাতে তোমায় সমর্পণ করতো—, সে কথা ঠিকই। তোমার অনেক সৌভাগ্য তুমি আজ রায় বাহাদুরের স্ত্রী নামে পরিচয় দিতে পারবে, তোমার অতীতের কাহিনী কেউ জানতে চাইবে না—"

"অতীতের কাহিনী—"

কৃষ্ণার মুখখানা সাদা হইয়া গেল, সে রায় বাহাদুরের মুখের পানে তাকাইল—।

রায় বাহাদুর বলিলেন, "হ্যাঁ—অতীতের কাহিনী—তুমি গরীবের মেয়ে, দেনার দায়ে তোমার বাবা তোমায় আমার হাতে দিয়ে দুই হাজার টাকা নিয়ে গেছেন—এ কথা কেউ জানতে চাইবে না, তোমার বর্ত্তমান সৌভাগ্যই তোমায় রক্ষা করবে।"

আস্তে আস্তে কৃষ্ণার মুখে স্বাভাবিক রং ফিরিয়া আসিল,—সে একটা হাল্কা নিঃশ্বাস ফেলিল।

অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া অস্ফুট কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করিল, "আর কোন দরকার আছে?"

রায় বাহাদুর উত্তর দিলেন, "না, এবার তুমি যেতে পার।"

নিঃশব্দ পদে কৃষ্ণা নিজের ঘরে আসিয়া দরজা ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দিল—

"আঁস্তাকুড়ের পাত কখনও স্বর্গে যায় না—"

কথাটা বার বার তাহার কানে বাজিতেছিল—

হয়তো সৌভাগ্যবশেই সে এ-ঘরের বধূরূপে আসিয়াছে,—কিন্তু এ সৌভাগ্য তো সে চায় নাই। সে যাহা চাহিল তাহা পাইল কই—?

অজয়ের আজ আসিবার কথা ছিল, হয়তো কোন জরুরী কল আছে—সে জন্যে সে আসিতে পারে নাই।

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত কৃষ্ণা জানালার ধারে চেয়ারটা লইয়া তাহাতে বসিয়া রহিল। অগ্রহায়ণের শেষ সময়, শীত পড়িয়া গিয়াছে। জানালা পথে হু-হু করিয়া ঠাণ্ডা বাতাস আসিতেছিল—তথাপি সে সরিল না।

দূরে লোক বিহীন পথ ও পার্ক দেখা যায়। বম্বিংয়ের ভয়ে বহু লোক কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছে নেহাৎ যাহাদের যাওয়ার স্থান নাই

তাহারাই রহিয়া গেছে। কদাচিত আজকাল পথে লোক দেখা যায়—। মনে হয় সারা সহর মরিয়া গিয়াছে, ডাকিলেও আজ কেহ সাড়া দিবে না।

কৃষ্ণা নিঃশব্দে বসিয়া রহিল, ঘরের আলো সে নিভাইয়া দিয়াছে—ঘরের ভিতর নিবিড় অন্ধকার।

"শঙ্কর দাদা—কোথায় আজ আছ শঙ্কর-দা, কৃষ্ণার গুরু শঙ্কর-দা—"

আজ চীৎকার করিয়া ডাকিতে ইচ্ছা হয়, প্রাণ ভরিয়া হাহাকার করিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু কৃষ্ণা ডাকা দূরে থাক, কাঁদিতেও পারিল না।

সে কোথায় যাইতে কোথায় আসিল—এতো সে চায় নাই—। এই ঐশ্বর্য্যের বোঝা সে আর বহন করিতে পারিতেছে না, পলে পলে শাসন আর সে মানিয়া চলিতে সক্ষম নয়—।

মুক্তি তাহার নাই,—একমাত্র মৃত্যু ছাড়া তাহাকে আর কেহই মুক্তি দিতে পারিবে না।

কৃষ্ণার দুই চোখ দিয়া নিঃশব্দে জল গড়াইয়া পড়ে। আজ যে মৃত্যুকে সে মনে প্রাণে কামনা করিতেছে, এই মৃত্যুকেই আগে যদি সে বরণ করিতে পারিত? কুমারের শুভ্র সমুজ্জ্বল দীপ্তিতে সে যাইতে পারিত—তাহার দেহ, তাহার আত্মা তো বিক্রীত হইত না।

যাদব-দা যেদিন আসিয়াছিল, সেদিন সে জোর করিয়া যদি চলিয়া যাইত—

রাধাচরণের কথা মনে পড়ে—

রাধাচরণ শাসাইয়া ছিলেন—কৃষ্ণার মামার নামে তিনি পুলিসে

জানাইবেন—অসদুদ্দেশে তিনি যুবতী ভাগিনেয়ীকে তাহার পিতার নিকট হইতে লইয়া গিয়াছেন।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল—মায়ের সম্বন্ধে তাঁহার জঘন্য উক্তি, সেখানেও ব্রজনাথের উপর দোষ দিয়া তিনি বলিয়াছেন—"যদি অতই ছিল—শক্তিময়ের সঙ্গে বিয়ে দিলেই হতো, এ গরীবকে মাঝে হতে নষ্ট করার কি দরকার ছিল—?"

শক্তিময়—শক্তিময়—

মনে পড়ে মায়ের মৃত্যুর পর তাঁহার বাক্সের বস্ত্রতলে একখানা ফটো কৃষ্ণা পাইয়াছিল, সেই ফটোতে ছিলেন তাহার মা, আর একজন পুরুষ—যাহাকে কৃষ্ণা চিনে না, জোর করিয়া পিতার যৌবনের মূর্ত্তি বলিয়া সে মানিতে চাহিয়াছিল।

কৃষ্ণার মুখখানা লাল হইয়া উঠে, সে আর ভাবিতে পারে না।

মা—মাগো—

একটিবার তুমি জাগো, একটিবার মূর্ত্তি ধরিয়া এসো, বল তুমি অপরাধিনী নও। তোমারই জন্য কৃষ্ণা স্বেচ্ছায় এ দুঃখ বরণ করিয়াছে, —তোমার একটী কথায় সে সব ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। আজ সে মরিলে তোমার জীবনের কলঙ্ক ঢাকিবে না—আরও প্রচার হইবে, তাই সে জীবনে মৃত্যু বরণ করিয়া এখানেই রহিয়া গেছে। একবার বলিয়া যাও মা—তুমি অপরাধিনী নও—তুমি সতী, তোমার অপবাদ মিথ্যা।

২১

অজয় আসিয়া পড়িল—

মিলিটারীতে সে কাজ লইয়াছে, তাহাকে বার্ম্মায় যাইতে হইয়াছিল, —বার্ম্মা জাপানীদের অধিকারে গেলে আজ তিনমাস তাহার কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই,—হঠাৎ সে আসিয়া পড়িল।

মা শ্যামবাজারে নাই, এই কয়মাস তিনি এখানেই আছেন।

মাতৃসমা ননদিনীকে স্থির রাখিয়াছে কৃষ্ণাই। রায় বাহাদুর মাস খানেক হইল দার্জ্জিলিংয়ে গিয়াছেন, সঙ্গে গিয়াছেন সুলেখা ও ইরা— কৃষ্ণাকে তিনি যাইবার জন্য অনুরোধ করেন নাই, কৃষ্ণাও বাঁচিয়া গেছে। সুলেখার বাড়ীতে তাহাকে লইয়া যাইবার প্রস্তাব রায় বাহাদুর করিলেও কার্য্যে তাহা হয় নাই, ইরার কথাটা মনে ছিল বলিয়াই রায় বাহাদুর কৃষ্ণাকে এড়াইয়া গিয়াছিলেন।

সেদিন হঠাৎ সুলেখার সহিত কৃষ্ণার দেখা হইয়া গিয়াছিল।

রায় বাহাদুরের শরীরটা অসুস্থ ছিল বলিয়াই তিনি বাহির হইতে পারেন নাই, সেইজন্য সুলেখা আসিয়া বাহিরে তাঁহার দেখা পান নাই। বহুকাল পরে ভিতর বাড়ীতে সুলেখা পদার্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীতে একটা চাঞ্চল্য জাগিয়া উঠিল।

মাসী পিসী দিদিরা আসিয়া পড়িলেন—কেহ কাঁদিলেন, কেহ সমবেদনার বাণী উচ্চারণ করিতে বিগলিত হইয়া পড়িলেন।—

"আহা, কতকাল পরে সুলেখা এসেছে গো—আমাদের সেই সুলেখা,

—এইতো সেদিনকার কথা যখন এতটুকুটি ছিল। বিয়ের পরে আর আসেনি—তা না আসুক, বাপের বাড়ীর কথা ভোলে নি—"

সুলেখা সমবেদনায় অস্থির হইয়া উঠিয়া ছিলেন,—পিতার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া এই বিপদের মধ্যে পড়িয়া তিনি তখন পলাইতে পারিলে বাঁচেন—

পিসিমা দুই চোখ মুছিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "বউ আমাদের আজ যদি বেঁচে থাকতো—তুই কি তফাতে থাকতে পারতিস সুলেখা—না বাইরে এসে বাপকে দেখে চলে যেতিস? আজ নেহাৎ দাদার অসুখ হয়েছে বলেই ভেতরে এসেছিস—নইলে—"

সুলেখা তাঁহাকে থামাইয়া দিলেন, "ওসব কথা অনেক পুরোনো হয়ে গেছে পিসীমা—যেতে দাও ও-কথা। বাবা কি নিজের ঘরে আছেন—আমি যেতে পারব ও-ঘরে?"

পিসীমা বলিলেন, "স্বচ্ছন্দে যেতে পারো—যেতে পারবে না কেন? আমি তো এই মাত্র ও-ঘর হতে এলুম কৃষ্ণাকে ওখানে রেখে—"

"কৃষ্ণা—"

সুলেখা মুখখানা বিকৃত করিলেন।

দরজার কাছে যাইতেই যে মেয়েটী দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল তাহার পানে তাকাইয়া সুলেখা থমকিয়া দাঁড়াইলেন—

কৃষ্ণা সুন্দরী কি কুৎসিতা এ সম্বন্ধে কোন কল্পনা তিনি কোনদিন করেন নাই। কেবল মাত্র শুনিয়া আসিয়াছেন তাঁহার পিতা তাহাকে গোপনে বিবাহ করিয়াছেন—পঁচিশ বৎসর পরে তিনি নূতন ভাবে সংসার পাতিয়াছেন।

কৃষ্ণা যে এমন সুন্দরী তাহা তিনি কোনদিন ধারণা করেন নাই বলিয়া, তাহার মুখের পানে চাহিয়া তিনি কি জন্য আসিয়াছেন তাহা ভুলিয়া গেলেন।

কৃষ্ণা ডাকিল, "ঘরে আসুন—"

হঠাৎ যেন সুলেখার চমক ভাঙ্গিয়া গেল—

"ও তুমিই বুঝি কৃষ্ণা,—তোমার বাবা তোমারই জন্যে দশ হাজার টাকা নিয়েছেন—?"

সুলেখার কথাগুলা তপ্ত শলাকার মতই কৃষ্ণার বুকে বিঁধিল, কিন্তু সে জ্বালা সে সহ্য করিয়া গেল; মৃদু হাসিয়া বলিল, "ভুল শুনেছেন, দশ হাজার টাকা নয়, আমার দাম মাত্র দুই হাজার টাকা; আমার বাবা দুই হাজার টাকা পেয়ে আপনাদের ঘরে আমায় তুলে দিয়ে গেছেন। আমি দু' হাজার টাকার কেনা দাসী মাত্র।"

সুলেখা চোখ তুলিয়া তাহার পানে চাহিবার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণা পাশ কাটাইয়া বাহির হইয়া গেল।

সেদিন বাড়ী ফিরিয়া কন্যার নিকট সালঙ্কারে এ ঘটনা বিবৃত করিয়া সুলেখা বলিলেন, "ছোটলোকের মেয়ের অহঙ্কার দেখেছিস ইরা, আমার মুখের ওপর আমায় যা না তাই শুনিয়ে দিয়ে ধার হয়ে গেল। উঃ, থাকতো ওখানে, আমি আরও দু' দশটা কথা শুনাতে পারতুম।"

ইরা বইয়ের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে বলিল, "খুব ভালো কাজ করেছেন। একে তো ছোটলোকের মেয়ে, তারপরে চেঁচামেচি করে ঝগড়া বাধালেই অতি চমৎকার হতো। যাই হোক, ছোটলোক হলেও তাঁর বুদ্ধি ভারী তীক্ষ্ণ দেখতে পাচ্ছি।"

কন্যার স্পষ্ট কথার ভয়ে সুলেখা আর কোন কথা তাঁহাকে বলিতে পারিলেন না।

দু' দিন বাদে একটু সুস্থ হইয়া রায় বাহাদুর দার্জ্জিলিং যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া লইলেন। কলিকাতায় ভীষণ গরম, এ অবস্থায় কলকাতায় থাকা একেবারেই অসাধ্য।

ইরা দাদুর সঙ্গ লইল—"আমিও যাব দাদু—" সুলেখা বলিলেন, "তাহলে আমিই বা এখানে একা পড়ে থাকি কেন, আমিও যাব—"

তাহার পর একটু থামিয়া বলিলেন—"নতুন বউ যাবে না বাবা—"

রায় বাহাদুর মুখ তুলিলেন—"না—"

তাঁহার কণ্ঠস্বর গম্ভীর—

ইরা কি একটা বলিবার উদ্যোগ করিতেই রায় বাহাদুর বাধা দিলেন,—"থামো, আমি যা ব্যবস্থা করেছি ঠিক তাই-ই হবে,—তার ওপর আর কেউ কোন কথা বলো না।"

ইহারই একদিন পরে তিনি সুলেখা ও ইরাকে লইয়া দার্জ্জিলিং চলিয়া গেলেন।

কৃষ্ণা যেমন নিস্তব্ধে ছিল—তেমনই রহিল।

অজয়ের মা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া তাহার মুখের পানে তাকাইলেন—অভাগী—সত্যই বড় অভাগী। একটা কথা আছে—

অতি বড় ঘরণী না পায় ঘর,
অতি বড় রূপসী না পায় বর।

সুরবালা সস্নেহে কৃষ্ণার মাথাটা কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া হাত বুলাইয়া দেন।

তাঁহার নীরব ভাষা কৃষ্ণা বুঝে; খানিকটা চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিয়া সে শশব্যস্তে উঠিয়া পড়ে—"ওদিকে অনেক কাজ পড়ে আছে দিদিমণি—"

সুরবালা বলেন, "থাক কাজ, দু'দণ্ড একটু বিশ্রাম নে কৃষ্ণা—। কি হবে এ সংসার এত করে গুছিয়ে, ছেড়ে দে এসব।"

কৃষ্ণা মলিন হাসি হাসে, বলে, "এই কাজ নিয়ে থাকতেই আমার খুব ভালো লাগে দিদিমণি—"

তা বটে, কৃষ্ণা কি লইয়া দিন কাটাইবে?

কথা বলিতে গিয়া সুরবালা চুপ করিয়া যান—মনের কথা মুখে ফুটানো যায় না।

এই সুন্দর ফুলটিকে গাছ হইতে তুলিয়া নৃশংস ভাবে পদতলে দলিত পিষ্ট করিবার অধিকার কি তাঁহার দাদার ছিল? জগতের সব হইতে বঞ্চিতা হইয়া কৃষ্ণা এখন একমাত্র আশ্রয় লইয়াছে ঠাকুর ঘরে, এ সংসারের প্রত্যেক কাজে নিজেকে এমন করিয়া জড়াইয়া ফেলিয়াছে যে, এক মুহূর্ত্ত হাঁফ ছাড়ার অবকাশও তাহার নাই।

সুলেখা দূরে গিয়াছে তবু সে আছে পিতার অতি কাছে। বেচারা কৃষ্ণা হয়তো কেবল মাত্র ভরণ পোষণই পাইবে, স্বামীর বিশাল সম্পত্তিতে তাহার বিন্দুমাত্র অধিকার থাকিবে না।

অজয় এখানে থাকিলেও তিনি একটা কোন উপায় ঠিক করিতে পারিতেন। অজয় কৃষ্ণার বিবাহের কিছুদিন পরেই মোটা বেতনে মিলিটারীর ডাক্তার হইয়া যুদ্ধে চলিয়া গিয়াছিল, অনেক দিন পরে সে ফিরিয়াছে।

যুদ্ধে আহত অবস্থায় সে তিনমাস কোথায় হস্‌পিটালে পড়িয়াছিল, সুস্থ হইয়া ছুটি লইয়া সে বাড়ী আসিয়াছে।

২২

অজয় আসিয়াছে—

প্রথমেই সে মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাড়ী ঘর ছেড়ে দিয়ে এখানেই স্থায়ী বাস করবার ব্যবস্থা করলে নাকি মা—বেশ তো মজা তোমার ?"

সুরবালা বলিলেন, "বাড়ীতে কেউ নেই যাকে নিয়ে থাকতে পারব, সে জন্যেও বটে—আর এই হতভাগী মেয়েটার মুখ চেয়েও বটে—আমার এখানে আসা আর থাকা—"

"কেন, হতভাগী মেয়েটা আবার কি করলে—"

বলিয়া অজয় সকৌতুকে কৃষ্ণার পানে চাহিল।

কৃষ্ণা হাসিল, তাহার উত্তর দিবার আগেই সুরবালা বলিলেন, "কি না করলো ? তোদের জ্বালায় এই বুড়ো বয়সে আমি যে জ্বলে মলুম অজু—"

"আমাদের জ্বালায়—?"

অজয় বিস্ময়ে মায়ের পানে তাকায়।

সুরবালা উত্তর দিলেন, "নিশ্চয়ই—তোদের জ্বালায় নয়তো কি ? হয় তুই—নয় তোর বুড়ো মামা—তোদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত তো

আমাকেই করতে হচ্ছে অজু। এই কচি মেয়েটা কি অপরাধ করেছে বল, যার জন্যে একে এত বড় দণ্ড সইতে হচ্ছে—?"

কৃষ্ণা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল, "যাই, চা খাবার নিয়ে আসি। বসবেন অজয়বাবু, যেন পালাবেন না।"

অজয় হাসিয়া বলিল, "পালাব আর কোথায় মামী, অভাগার এক মাত্র আশ্রয় স্থলকে এনে তোমার অঞ্চলের খুঁটে যখনই বেঁধেছো, তখন অভাগাও তো বাঁধা পড়ে গেছে জানো।"

কৃষ্ণা হাসিয়া চলিয়া গেল।

এবার অজয় গম্ভীর মুখে বলিল, "তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারলুম না মা, আমায় সব কথা গুছিয়ে বল, অমন এলোমেলো করে বললে আমি কিছুই বুঝতে পারব না।"

মা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "বলছি এই হতভাগী মেয়েটার কথা। এত রূপ, এত গুণ কিন্তু সবই যে নষ্ট হয়ে গেল অজু—"

তিনি চোখ মুছিলেন।

অজয় বলিল, "নষ্ট যখন হয়েই গেছে মা, আর তা তাজা করার ক্ষমতা তো আমাদের নেই—"

সুরবালা দৃপ্ত হইয়া বলিলেন, "নেই কিসে? এই যে কয়েকমাস আগে শুনছিলুম কি একটা আইন হচ্ছে তাতে এ-রকম মেয়েরা বিবাহ-বিচ্ছেদ করতে পারে, আবার বিয়ে করতে পারে—"

অজয় গম্ভীর মুখে হাসিল, বলিল, "হ্যাঁ, সেটার নাম রাওবিল। এখনও তো সে বিল পাস হয়নি মা, হলে তখন ও-সম্বন্ধে কি করা

যাবে—করা না যাবে বিবেচনা করে দেখা যাবে। আমি তো এতদিন যুদ্ধের হ্যাঙ্গামায় কাটিয়ে এলুম, ভারতে এ বিল নিয়ে কি আন্দোলন হল, কতজন স্বপক্ষে কত জন বিপক্ষে দাঁড়াল, তার কিছুই জানিনে। আমার মতে আমি এই কথাই বলব রাওবিল পাস হলেও আজই তা কার্য্যকরী হবে না। হয়তো হবে—কিন্তু কিছুদিন বাদে। দু' একজনে এখন হতেই সে সুযোগ সুবিধা নিচ্ছে বা পাওয়ার আশা করছে, তুমি নিশ্চয়ই তার মধ্যে একজন নও মা—।"

সুরবালা বলিলেন, "ভালোমন্দ জানিনে বাছা, মেয়েটার দিকে তাকালে সত্যই কষ্ট হয় তাই বলি। তারপর—বিয়ে না হয় হ'ল—তার ভবিষ্যতের জন্যে দাদার ব্যবস্থা করা কি উচিত নয়?"

অজয় দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "নিশ্চয়ই উচিত।"

সুরবালা বলিলেন, "কিন্তু সুলেখা সে ব্যবস্থা করতে দিচ্ছে কই? আবার শুনছি তার স্বামীও এসেছে—সেই যে—সেই হতভাগাটা—যার কথা তুই সেবার বিলেত হতে এসে বলেছিলি। সেই লোকটা সুলেখাকে এগিয়ে দিয়ে নিজে পিছনে আছে, সুলেখা আর তার মেয়েটা দিনরাত ছায়ার মত দাদার পেছনে ঘুরছে।"

একটু থামিয়া তিনি বলিলেন, "দাদাও যে এই হতভাগা মেয়েটার কথা ভাবতে ভুলে যাবেন তা জানিনে।"

তাহার পর গলার সুর খাদে নামাইয়া বলিলেন, "শুনলুম যাওয়ার আগের দিন উইল পত্র হয়ে গেছে, কৃষ্ণা শুধু খোর পোষ পাবে, আর কিছুই পাবে না।"

গর্জ্জিয়া অজয় বলিল, "অসম্ভব—এ কথনই হতে পারে না।"

আর্দ্রকণ্ঠে সুরবালা বলিলেন, "আমি একথা কৃষ্ণাকে বা আর কাউকে বলতে পারিনি। কৃষ্ণার খোর পোষের টাকাও দেবে ওই সুলেখা— কিন্তু এ-মেয়ে তাই কি নেবে? আমার মনে হয়—শুকিয়ে মরবে তবু সুলেখার হাত হতে কিছু নেবে না।"

অজয় বলিল, "তা আমিও জানি। কিন্তু এ বাড়ী—"

সুরবালা বলিলেন, "এ বাড়ী থাকবে তোর নামে অজু, এর ঠাকুর সেবা, আত্মীয় স্বজন—"

বাধা দিয়া ক্রুদ্ধ কণ্ঠে অজয় বলিল, "চুলোয় যাক। একদিন মামার কাছে সাহায্য নিয়ে আমায় পড়তে হয়েছে, সে জন্মে আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ হতে পারি, তা বলে উনি যে অন্যায় করবেন তা আমি মানতে পারিনে মা। ও মেয়েটীর তো কোনও অপরাধ নেই মা, তবে ওকে সব হতে বঞ্চিত করা হল কেন?"

সুরবালা উত্তর দিলেন, "সে কথা দাদাই জানেন অজু—হঠাৎ কেন যে উইল করলেন—দার্জ্জিলিং চলে গেলেন তার কারণও আমি খুঁজে পাইনি, জিজ্ঞাসা করলেও কিছু বলেন নি।"

অজয় হঠাৎ গা ঝাড়া দিল—"যাক গিয়ে, যেতে দাও মা এখন ও-সব কথা, এর পরে ও-সব কথা হবে। মামী গেল কোথায় চা-আনবার নাম করে দেখা যাক—"

সে উঠিল—

কৃষ্ণার দেখা মিলিল,—নিজের ঘরে বসিয়া সে একখণ্ড ভেলভেটের উপর রেশমের ফুল তুলিতেছে।

অজয় গম্ভীর মুখে ঘরে প্রবেশ করিল, গম্ভীরভাবে একখানা

চেয়ারে বসিল,—গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "আমি তোমার এ অন্যায় সহ্য করতে পারব না মামী,—যথাযোগ্য বিচার করে এর শাস্তি দেব।"

কৃষ্ণা মুখ তুলিল, তাহার মুখে মৃদু হাসির রেখা, উঠিয়া পড়িয়া সে বলিল, "ওই যাঃ, আপনার চা' খাবার আনতে এসে ভুলে গিয়ে ঠাকুরের সিংহাসনে পাতবার আসন তৈরী করতে বসে গেছি। আচ্ছা, আপনি বসুন অজয় বাবু, আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসছি।"

সে দাঁড়াইতেই অজয় ধমক দিল, "চুপ, লক্ষ্মী মেয়েটির মত বসে যা বলি তাই শোন দেখি। কথা নেই, বার্ত্তা নেই—অমনি তাড়াতাড়ি চলছো খাবার তৈরী করতে; বসো দু'দণ্ড, চা খাবার এখন না হলেও চ'লবে—। তোমার মনে রাখা উচিত অজয় এমন ছেলে নয় যে, না খেয়ে মামার বাড়ীতে এই সময়ে এসেছে।"

কৃষ্ণা বসিয়া ত্যক্ত ভেলভেট খানা আবার হাতে তুলিয়া লইল।

অজয় বলিল, "ঠাকুরের জন্যেই তো সমস্ত সময়টা অপব্যয় করলে মামী, নিজের জন্যে কিছু করতে পারলে কি ?"

"নিজের জন্যে—"

বিস্মিতা কৃষ্ণা মুখ তুলিল—

অজয় বলিল, "হ্যাঁ নিজের জন্যে—অর্থাৎ নিজের বাঁচার উপায়, নিজের ভরণ-পোষণের উপায়,—সোজা চলার পথ, সে-সব কথা কোন দিন ভেবেছ কি ?"

কৃষ্ণা এবার বুঝিল—তাই হাসিল।

অজয় রাগ করিয়া বলিল, "হেসে উড়িয়ে দেওয়ার কথা যে এটা নয়, তা নিশ্চয়ই তুমি বুঝছো, এটুকু শিক্ষা আর জ্ঞান নিশ্চয়ই তোমার

আছে মামী। বয়স তোমার আজ হয়েছে, সংসারের মধ্যে এসে পড়ে এর স্বরূপও নিশ্চয় চিনেছো—"

কৃষ্ণা ধীরকণ্ঠে বলিল, "চিনেছি বলেই আমি তফাতে সরতে চাই অজয়বাবু—।"

অজয় বলিল, "যা তোমার অবশ্য প্রাপ্য, তা তুমি নিতে চাও না?"

কৃষ্ণা উত্তর দিল, "আমি তো দাবী নিয়ে এ সংসারে আসিনি অজয়বাবু, আমি এ সংসারের ক্রীতদাসী মাত্র, আমার বাবা টাকা নিয়ে আমায় বিক্রী করে গেছেন, সে কথাটা তো আমি ভুলতে পারিনে অজয়বাবু—"

অজয় চেঁচাইয়া উঠিল, "থামো—থামো মামী, ওই বিকৃত মনের ভাবটা তোমার মুছে ফেলা উচিত।"

কৃষ্ণা সেলাই রাখিয়া মুখ তুলিল, দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "আমি মুছতে চাইলেও বা মুছতে চাচ্ছে কে? আপনার দিদি আমায় পত্র লিখে জানিয়েছেন—আমায় পত্রপাঠ চলে যেতে হবে—তাঁর পিতার সংস্পর্শে আমি জীবনে আসতে পারব না। পত্র দেখতে চান—দেখুন।"

সে উঠিয়া ড্রয়ারের ভিতর হইতে একখানা পত্র আনিয়া অজয়ের হাতে দিয়া আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেল।

২৩

গভীর রাত্রি—

বাড়ীর সকলেই নিদ্রিত,—নিজের শয্যায় কৃষ্ণাও ঘুমাইয়াছে।

কখন হঠাৎ তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল—মনে হইল ঘরের মধ্যে কে সন্তর্পণে চলাফেরা করিতেছে,—তাহার পায়ের খস্ খস্ শব্দ কানে আসে—

"কে, কে ঘরের মধ্যে—"

হাত বাড়াইয়া সে বেড-সুইচ টিপিবার সঙ্গে সঙ্গে ঘর আলোকিত হইয়া উঠিল। বিস্মিত নেত্রে সে চাহিয়া দেখিল—তাহার সামনে দাঁড়াইয়া দুইজন লোক, দুইজনেরই হাতে উদ্যত রিভল্ভার—

"চুপ—"

একজন চাপা গলায় বলিল, "একটি শব্দ তোমার মুখ হতে বার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমার কপালে এই গুলি বিঁধবে—সাবধান—"

কৃষ্ণার মুখখানা বিবর্ণ হইয়া গিয়া পর মুহূর্তে স্বাভাবিক বর্ণ ধরিল। সে আস্তে আস্তে বলিল—"গুলি খেয়ে মরতে আমি চাইনে—কাজেই আমি চীৎকার করব না। আমি শুধু জানতে চাই—কে তোমরা, কি চাও ?"

লোকটি উত্তর দিল, "আমরা কে তা দেখেই বুঝছো, আমরা কি চাই তাও বুঝছো, তবু বলছি—আমরা চাই টাকাকড়ি, গহনাপত্র—"

"অনন্ত—"

জানালার বাহিরে কাহার চাপা কণ্ঠস্বর শোনা গেল—সঙ্গে সঙ্গে খোলা জানালায় যাহাকে দেখা গেল,—সে কৃষ্ণার অপরিচিত নয়—

"শঙ্কর-দা—"

শব্দটা মুখ হইতে বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে লোকটি কৃষ্ণার পানে তাকাইয়া নিঃশব্দে ওষ্ঠের উপর একটা আঙ্গুল তুলিল।

তাহার পর লোক দুইটির পানে তাকাইয়া বলিল, "তোমরা বাইরে এসো, আমি দেখছি।"

সে জানালা টপ্‌কাইয়া ভিতরে আসিল—

নিঃস্তব্ধ ঘরে শঙ্কর ও কৃষ্ণা—

রুদ্ধকণ্ঠে কৃষ্ণা বলিল, "তুমি আজ ডাকাতি করতে এসেছো শঙ্কর-দা,—আমি যে এ-ধারণা এ-চিন্তা কোনদিন করতে পারিনি—"

তাহার চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল।

একটু হাসিয়া শঙ্কর বলিল, "এর জন্যে অমনই কেঁদে ফেললে কৃষ্ণা—? কেন যে ডাকাতি করতে এসেছি তা জান্‌লে কাঁদতে না এ-কথা ঠিক। কিন্তু আমিও তোমায় এখানে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেছি কৃষ্ণা, আমি জানতুম না—যে লোক আজও পদে পদে আমাদের শত্রুতা করছে—যার চক্রান্তে আমরা সবাই আজ বিপদগ্রস্ত, তুমি তারই স্ত্রী? আশ্চর্য্য—তোমার বাবা টাকা নিয়ে শেষে এই নরপশুটার হাতে তোমায় অর্পণ করেছেন,—তোমার দিকটা তিনি একবার দেখলেন না, একবার ভাবলেন না?"

কৃষ্ণা ধীরকণ্ঠে বলিল, "পিতার কর্ত্তব্য তিনি পালন করেছেন

শঙ্কর-দা,—আমায় তিনি বড় ঘরে, আভিজাত্য সমাজে তুলে দিয়েছেন—তাঁকে তুমি দোষ দিতে পারো না। কিন্তু আমার স্বামীর সম্বন্ধে তুমি যা বলছো—আমি তার কিছুই বুঝতে পারছি নে।"

শঙ্কর বলিল, "আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। তোমার স্বামী রায় বাহাদুর কার্য্যতঃ গভর্ণমেণ্টের কাজ ছেড়ে দিলেও পরোক্ষে অনেক কাজ করে দেন। তাঁর মেয়ে তাঁর একটি প্রধাণ স্পাই—তাঁর জামাই যুদ্ধ হতে ফিরে এই বিভাগেই বড় কাজ পেয়েছেন শুধু রায় বাহাদুরের খাতিরে। রায় বাহাদুরের মেয়ে আমাদের গ্রুপের একখানা ফটো যোগাড় করে বাপকে দিয়েছেন, আমরা খবর পেয়েছি সে ফটো আজও তাঁর কাছেই আছে—। আমাদের পত্র পেয়ে ভয় পেয়ে তিনি কলকাতা ছেড়ে চলে গেলেও সে ফটো নিয়ে যেতে পারেন নি। আমরা সেই ফটো নিতে আর আমাদের যে-সব সঙ্গীদের বিচার চলছে তাদের বিচারের ব্যয় নির্ব্বাহের খরচ সংগ্রহ করবার জন্যে তাঁর বাড়ীতে অনাহুত ভাবেই এসেছি কৃষ্ণা।"

কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করিল, "সে ফটো যে বাড়ীতেই আছে এ খবর তোমরা কার কাছে পেলে জিজ্ঞাসা করলে—উওর দেবে শঙ্কর-দা?"

শঙ্কর একটু হাসিল, তাহার পরই গম্ভীর হইয়া বলিল, "তোমার কাছে কোনদিনই কিছু গোপন করিনি কৃষ্ণা—আজও করব না। জীবনে একদিন যে মহা ভুল করেছি—জানি চিরকালই সে ভুলের জের বয়ে চলতে হবে—সেইজন্যে কঠোরতর প্রায়শ্চিত্ত্য করে চলেছি।"

কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভুল করেছো শঙ্কর-দা?"

শঙ্কর উত্তর দিল, "যে ভুল করেছি তা আমার বুকের আড়ালেই

থাক কৃষ্ণা,—তোমার শান্তি সুখের মধ্যে সে-কথা আর নাই বা তুললুম। আমার যে পথ আমি বেছে নিয়েছি—এই পথ বেয়েই আমি চলি, চলতে চলতে একদিন কোথায় গিয়ে ঠেকবো তাই বা কে জানে—হয় বাঁচব, নয় মরব, যা মানুষের চিরদিনের অদৃষ্ট-লিপি। আমি আজ সম্পূর্ণ একা কৃষ্ণা, আমার বাঁচার প্রার্থনাও কেউ করবে না, মরলেও কেউ একফোঁটা চোখের জল ফেলবে না।"

কৃষ্ণা নত মুখে ছিল, মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, কাকিমা—?"

শঙ্কর উত্তর দিল, "মা নেই—একদিন আমারই কোলে মাথা রেখে তিনি মারা গেছেন, বাবা আর আমার মুখ দেখেন নি, আমি একাই আমার দলের অনুগত হয়ে চলেছি।

বাহিরে শীষ দেওয়ায় শব্দ হইল—

ত্রস্তভাবে শঙ্কর বলিল, "আমাদের কাজ শেষ হয়ে গেছে কৃষ্ণা, আমি চলছি।"

কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমাদের কে খবর দিলে সে কথা তো বললে না শঙ্কর দা?"

শঙ্কর চলিতে গিয়া ফিরিল, বলিল, "খবর দিয়েছে ইরা, তোমার সম্পর্কে নাতনী হয়। বিশ্বাস কর কৃষ্ণা, এই পাপিষ্ঠ রায় বাহাদুরেরও ইরার মত নাতনী হয়।"

ফিরিয়া সে কৃষ্ণার ঠিক সামনে দাঁড়াইল—

"আজ তোমার গহনাও নিয়ে চললুম কৃষ্ণা, কারণ জানি এ সংসারের কিছুই তোমার নয়—। আমি এ বাড়ীর বউয়ের সম্বন্ধে অনেক কথা

শুনেছি—কিন্তু সে বউ যে তুমি তা জানতুম না, যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তুমি স্বচ্ছন্দে আমার নাম বলে দিয়ো কৃষ্ণা, আমি তাতে তোমার দোষ দেব না—।”

“শঙ্কর-দা—”

কৃষ্ণা শঙ্করের পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িল—“তুমি কৃষ্ণাকে আজও চেনোনি, শঙ্কর-দা—? জীবনে যে, কোনদিন কিছু পেলে না—সে—”

তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল।

আলগোছে তাহার মাথার উপর হাতখানা রাখিয়া আর্দ্র কণ্ঠে শঙ্কর বলিল, “আমার ভুলের জের তুমিই বয়ে চললে কৃষ্ণা, কিন্তু আর উপায় নেই, আর পথ নেই। তোমার শঙ্করদাকে তুমি ভুলে যেয়ো কৃষ্ণা, মনে কোরো—শঙ্কর নামে যাকে চিনতে সে মরে গেছে—”

“শঙ্কর—”

জানালায় যে মুখখানা দেখা গেল—সে মুখও কৃষ্ণার অপরিচিত নয়,—কৃষ্ণার মনে পড়িয়া গেল এই মুখই সে মায়ের ফটোতে দেখিয়াছে।

“যাই শক্তি-দা—”

কৃষ্ণা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়াছিল, যখন হাত নামাইল তখন শঙ্কর চলিয়া গিয়াছে।

“মাগো—”

কৃষ্ণা বিছানার উপর লুটাইয়া পড়িল।—

২৪

কলিকাতার জনবহুল দক্ষিণাঞ্চলে বালিগঞ্জের মত জায়গায়—ধনী রায় বাহাদুরের বাড়ী যে, নিশীথে এমনভাবে ডাকাতি হইতে পারে ইহা একেবারেই আশ্চর্য্যজনক।

সংবাদ পাইয়া রায় বাহাদুর দার্জ্জিলিং হইতে বাড়ী আসিলেন। ইরার শরীর অসুস্থ বলিয়া সে আসে নাই, সে জন্য সুলেখাও আসিতে পারিলেন না।

ঠিক সেই দিনে রাধাচরণও আসিয়াছেন—তাঁহার কিছু টাকার দরকার। কয়েকদিন আগে কন্যাকে তিনি পত্র লিখিয়াছিলেন, কৃষ্ণা কোনও উত্তর দেয় নাই।

কৃষ্ণার নিকটে তিনি খবর পাঠাইলেন—বিশেষ দরকার, এখনই তিনি একবার দেখা করিতে চান।

রায় বাহাদুর তখন বহির্বাটীতে বড় ব্যস্ত—কোনদিকে দৃষ্টি দিবার সময় তাঁহার ছিল না। রাধাচরণ সোজা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

কৃষ্ণা তখন স্নানান্তে পূজার ঘরে যাইতেছিল—রাধাচরণ আসিয়াছেন শুনিয়া সে বিরক্ত হইলেও সে ভাব প্রকাশ করিল না, তাঁহাকে বসাইতে বলিয়া সে ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিল।—

কাল রাত্রের কথা তাহার মনে উজ্জলভাবে জাগিতেছিল।

শঙ্করকে সে ঘৃণা করিতে পারে নাই—বরং শ্রদ্ধায় তাহার সমস্ত অন্তর ভরিয়া উঠিয়াছিল। আত্মভোলা শঙ্কর—

চিরদিনের ঘর ছাড়া সে, ঘরের বন্ধন একদিন তাহার কাছে অতি তুচ্ছ হইয়াছিল—। আজ বহুদিন আগেকার কৃত কাজ তাহার মনে অনুশোচনা জাগাইয়াছে, সে নিজের ভুল বুঝিয়াছে, সে ভুল সংশোধন করিবার আজ কোন উপায় নাই।

কিন্তু সেই লোকটী—

বিদ্যুৎ চমকের ন্যায় সেই লোকটীর আকৃতি কৃষ্ণার মনে জাগিয়া উঠে।

স্বপ্নের মত মনে হয়—ইহাকে কৃষ্ণা বাল্যে দেখিয়াছে। মায়ের পাশে সে এই লোকটীর ছবি দেখিয়াছিল—।

শঙ্কর ইহার নাম ধরিয়াছিল—ডাকিয়াছিল শক্তি-দা—

শক্তি-দা—সেই প্রসিদ্ধ নামা শক্তিময় নয় কি ?

গ্রামেরই ছেলে ছিল সে—ছোটবেলা হইতে ডানপিটে, অত্যন্ত শক্তি-শালী ; ভয় কাহাকে বলে সে তাহা জানিত না।

বাড়ীর কাহারও মুখে সে শক্তিময়ের নাম শুনে নাই। যাদব-দা তাহার নাম শুনিয়াও শুনে নাই, মা নির্ব্বাকে তাহার মুখে শক্তিময়ের গল্প শুনিয়া গিয়াছেন।

মামার কাছে সে শুনিয়াছিল, শক্তিময় ছিলেন তাঁহার পরমবন্ধু—তাঁহার কার্য্যে তিনি যোগ দিয়াছিলেন, তাহার পর ভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি নিজের কার্য্যের স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন।

পিতার মুখে সে এই শক্তিময়ের সম্বন্ধে কত কথাই না শুনিয়াছে।

কৃষ্ণার বুকের রক্ত জমিয়া যায়।

নিস্তব্ধে কৃষ্ণা বিগ্রহের পানে চাহিয়া থাকে—

একবার বল দেবতা—একটীবার বল ; কৃষ্ণা যাহা শুনিয়াছে সে সব মিথ্যা। সেই গ্লানিই যে তাহাকে অহোরহ যন্ত্রণা দিতেছে,—রাধাচরণ এই কথা প্রকাশ করিবে ভয় দেখাইয়াই তাহাকে হাতের মুঠায় রাখিয়াছেন। তুমি একটিবার বল দেবতা, একটিবার বল সে সব কথা মিথ্যা—।

পাথরের দেবতা কথা বলিল না—

কৃষ্ণার দুই চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়ে—সে প্রণাম সারিয়া চোখ মুছিয়া উঠে।

বসিবার ঘরে রাধাচরণ অস্থিরভাবে কৃষ্ণার অপেক্ষা করিতেছেন—কৃষ্ণা সেই ঘরে প্রবেশ করিল।

দীর্ঘ দিন পরে পিতা কন্যার দেখা—বিবাহের পর প্রায় দুই বৎসর কাটিয়া গেছে। প্রথম তিন চার মাস বাদেই তিনি মাসিক কিছু করিয়া পাইবার প্রার্থনা জানাইয়া কন্যা জামাতাকে পত্র দিয়াছেন—কেহই কোন উত্তর দেন নাই। দীর্ঘ দিন তাঁহার পত্র পাওয়া যায় নাই, এবার পত্র না দিয়া তিনি সশরীরে আসিয়াছেন।

ইচ্ছা না থাকিলেও কৃষ্ণা প্রণাম করিল, রাধাচরণ আশীর্ব্বাদ করিলেন,—তাহার পরই কাজের কথা সুরু করিলেন—

"তার পর মা, বুড়া বাপ মরলো কি বাঁচলো, একটিবার তার খোঁজ নিতে নেই? আমি পত্র দিলুম, দু' জনের কেউ তার একটা উত্তর পর্য্যন্ত দিলে না—একেবারে চুপ-চাপ, যেন তোমরা কেউই লিখতে পড়তে পারো না—পত্রের জবাব পর্য্যন্ত দাও নি।"

কৃষ্ণা মৃদুকণ্ঠে বলিল, "উত্তর না যাক আপনাকে এ পর্য্যন্ত 'প্রতি মাসে পঁচিশ টাকা করে পাঠানো হচ্ছে, তাই আপনার পক্ষে যথেষ্ট। একা মানুষের ওর চেয়ে বেশী খরচ পড়ে না বলেই আমার ধারণা—"

"তোমার ধারণা—"

স্থান কাল পাত্র ভুলিয়াই অভ্যাসবশে রাধাচরণ চেঁচাইয়া উঠিলেন, "তোমার ধারণা যাই হোক, আজকালকার এ দিনে তাতে দিন চলে না। যুদ্ধ মিটিলে কি হবে, যুদ্ধের জের তো এখনও চলছে,—কোন জিনিসই হঠাৎ পাওয়ার যো নেই, সবই কণ্ট্রোল—। তোমরা বড় মানুষ, আমাদের অবস্থা বুঝবে কি করে বল ?"

কৃষ্ণা গম্ভীর মুখে বলিল, "চেঁচাবেন না—আপনি এখন কি বলতে চান বলুন।"

রাধাচরণ বলিলেন, "আমার এখন কিছু টাকা চাই, সেই টাকা পেলেই চলে যাব।"

কৃষ্ণা একমুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিল, "মাস পাঁচেক আগে মাসোহারা ছাড়াও আপনি যে তিনশো টাকা নিয়ে গেছেন শুনলুম বাইরে থেকে; সে টাকা কি করলেন ?"

আপাদ মস্তক জ্বলিয়া যাইতেছিল, নিজেকে যতদূর সম্ভব প্রকৃতিস্থ রাখিয়া রাধাচরণ বলিলেন, "যাই করি সে কৈফিয়ৎ তোমার কাছে দেব না কৃষ্ণা, তুমিও তা চাইতে পারো না। সে টাকা রায় বাহাদুর আমায় দিয়েছেন, তোমার কাছ হতে নেই নি।"

স্থিরকণ্ঠে কৃষ্ণা বলিল, "ভালো কথা, কিন্তু আজ আবার কত টাকা আমার কাছ হতে দরকার শুনি।"

রাধাচরণ উত্তর দিলেন, "পাঁচশো—"

একমুহূর্ত্তে কৃষ্ণা ধৈর্য্য হারাইল, রুক্ষকণ্ঠে বলিল, "আবার পাঁচশো, —এ টাকা কি করবেন ?"

রাধাচরণ বলিলেন, "আগেই বলেছি—কৈফিয়ৎ আমি কারও কাছে কোনদিন দেব না।"

কৃষ্ণার মুখখানা লাল হইয়া গিয়াছিল, বলিল, "আমি যে দিতে পারব তা আপনি কি করে জানলেন ? আমার কাছে তো একপয়সাও থাকে না—সে কথাও আপনি জানেন।"

রাধাচরণ হাসিলেন—বলিলেন, "আমায় ভুল বুঝিয়ো না কৃষ্ণা, তোমার গায়ে হাজার হাজার টাকা দামের গহনা আছে যা হতে একখানা দিলে আমার অভাব মিটে যেতে পারে, আমি জেলে যাওয়া হতে নিস্তার পেতে পারি।"

ঘৃণাপূর্ণ কণ্ঠে কৃষ্ণা বলিল, "আপনি জেলেই যান, আমি আপনাকে রক্ষা করতে কিছুই দেবনা—"

সে ফিরিল—

রাধাচরণ বাধা দিলেন—"শোন, দাঁড়াও কৃষ্ণা, আমার একটী কথা শুনে তুমি যাও। তোমায় এই ধনীর ঘরে দেওয়ার উদ্দেশ্য কি জানো—কেবল টাকা নেওয়া। তুমি যদি আজ আমায় কিছু না দাও, আমি তোমার স্বামীকে সব জানাব। এ কেলেঙ্কারী প্রকাশ হলে সমাজে তিনি ঘৃণিত অপদস্থ হবেন, কাজেই বাধ্য হয়ে আমায় টাকা তিনি দেবেন।"

কৃষ্ণা আরক্ত মুখে বলিল, "দেখুন, আপনি এতদিন আমায় ভয়

দেখিয়ে অনেক কিছু করেছেন—আজ জেনে যান ভয় দেখিয়ে আমার যত ক্ষতিই করুন আমি ভয় পাব না। আপনি বলবেন—আমার পিতা শক্তিময় নামে একজন লোক, আপনি বলবেন, শঙ্করদার সঙ্গে আমার অবৈধ সম্পর্ক আছে,—আমি আপনাকে অনুমতি দিচ্ছি—স্বচ্ছন্দে আপনি এ সব কথা রায় বাহাদুরের কানে তুলুন। এটুকু জেনে রাখুন—তাঁর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কই নেই, তাঁর সম্পত্তি পাওয়ার জন্যে আমি লালায়িতাও নই। আপনি যদি পারেন—তাঁর কাছ হতে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করুন গিয়ে—”

সে বাহির হইয়া গেল।

২৫

অত্যন্ত অসময়ে রায় বাহাদুর ভিতর বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন—বাড়ীটি যেন সজাগ হইয়া উঠিল।

রায় বাহাদুর কোনদিকে না চাহিয়া সোজা শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন—দাসীকে দিয়া কৃষ্ণাকে খবর পাঠাইলেন বিশেষ দরকার, এখনই আসা চাই—।

কি যে দরকার তাহা কৃষ্ণা জানে—। অন্য দিন হইলে সে অন্ততঃ খানিকক্ষণ বিলম্বও করিত, আজ সে এতটুকু বিলম্ব করিল না, মাথা উন্নত করিয়াই দরজার পর্দা সরাইয়া ঘরে প্রবেশ করিল।

রায় বাহাদুর নিস্তব্ধে একখানা ইজি-চেয়ারে বসিয়া আছেন,—

'তাঁহার মুখ অত্যন্ত গম্ভীর।

আজই সকালে তিনি আসিয়া পৌঁছাইয়াছেন, কাল সকালে তাঁহাকে টেলিগ্রাম করা হইয়াছিল। সকাল হইতে বাড়ীতে পুলিস আসিয়াছে, তদন্ত চলিয়াছে। দেখা গিয়াছে পরশু রাত্রে ডাকাতেরা কিছুই লয় নাই, কেবল আলমারীটা খুলিয়া সব কিছু ছড়াইয়াছে।

রায় বাহাদুর আসিলে জানা গিয়াছে—ওই আলমারীর মধ্যেই রাজদ্রোহীদের সম্বন্ধে সব কিছু কাগজ পত্র ফটো প্রভৃতি ছিল। যাহারা আসিয়াছিল, তাহারা যে এইগুলিই সংগ্রহ করিতে আসিয়াছিল তাহাতে পুলিসের বা রায় বাহাদুরের অনুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

কৃষ্ণা খানিক দাঁড়াইল, রায় বাহাদুর একটিবারও তাহার পানে তাকাইলেন না।

কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি আমায় ডাকছেন!"

রায় বাহাদুর সচকিত হইয়া উঠিয়া তাহার পানে তাকাইলেন,—আর্দ্রকণ্ঠে বলিলেন, "হ্যাঁ, ডেকেছি, এই চেয়ারটায় বসো, কথা আছে।"

তিনি তাঁহার সামনের চেয়ারখানা দেখাইয়া দিলেন। কৃষ্ণা বসিল না, চেয়ারে ভর দিয়া পিছনে দাঁড়াইল।

রায় বাহাদুর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ডাকিলেন, "কৃষ্ণা—"

কৃষ্ণা উত্তর দিল, "বলুন—"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "তোমার বাবা এসেছেন তা জানো?"

শক্তকণ্ঠে কৃষ্ণা বলিল, "জানি, তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করেছেন, আমিই তাঁকে বলে দিয়েছি তাঁর যা বক্তব্য আছে আপনার কাছে বলতে পারেন।"

রায় বাহাদুরের মুখখানা অত্যন্ত কঠোর হইয়া উঠিল,—তীব্রকণ্ঠে বলিলেন, "হ্যাঁ, তিনি আমায় সব বলেছেন। আমি তাঁকে সহজে ছাড়ব না কৃষ্ণা, তোমাকেও ছাড়ব না। যদি সেকাল হতো আমি তোমাদের মত পাপিষ্ঠ পাপিষ্ঠাকে শাস্তি দিতুম জানো? মাটিতে তোমাদের কোমর পর্য্যন্ত পুতে দিয়ে কুকুর লেলিয়ে দিতুম, সেই হতো তোমাদের পাপের শাস্তি।"

তিনি জ্বলন্ত চোখে কৃষ্ণার পানে তাকাইলেন।

কৃষ্ণার আজ ভয় বা সঙ্কোচ ছিল না, সে বলিল, 'কিন্তু আপনি আমার কি অপরাধ পেয়েছেন সেই কথা বলুন।"

উচ্ছ্বসিত ক্রোধে রায় বাহাদুর বলিলেন, "তুমি?—তুমি সব জানো, —সব কিছুর মূলেই আছ তুমি। তুমি আমার মান সম্ভ্রম, আমার বংশমর্য্যাদা, এমনকি আমার কুলদেবতাকে পর্য্যন্ত অপবিত্র করেছো তোমার স্পর্শ দিয়ে "তা জানো—?"

স্থিরকণ্ঠে কৃষ্ণা বলিল, "আপনি আপনার কুলদেবতাকে মানেন?"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "মানি কি না তা তোমার মত পাপিষ্ঠা একটি মেয়েকে আমি বলতে পারিনে। মোটের উপর আমি তোমায় বলছি—তোমায় আমি ক্ষমা করতে পারিনে কৃষ্ণা—কিছুতেই না।"

কৃষ্ণা বলিল, "কিন্তু আমি বলছি সব শুনলে আপনি নিশ্চয়ই আমায় ক্ষমা করতে বাধ্য হবেন—আপনার মহত্ত্ব আমি জানি। আমি জানি—আমার বাবা আপনার হাতে-পায়ে ধরেছিলেন এতটুকু দয়ার জন্যে;—যিনি আপনার কাছ হতে দুই হাজার টাকা নিয়ে মেয়েকে আপনার হাতে তুলে দিতে পারেন, মাস-মাস টাকা নিতে পারেন—

তারপর আজ তিনশো টাকা, কাল পাঁচশো টাকা—এমনি করে টাকা চাইতে প্রায় যিনি আসেন—"

তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল, নেহাৎ অশ্রু সামলাইবার জন্যই সে মুখ ফিরাইল—

রায় বাহাদুর নিস্তব্ধে খানিকক্ষণ তাহার পানে তাকাইয়া রহিলেন, —কঠিন বিচারকের দৃষ্টি—

"শোন কৃষ্ণা—

কৃষ্ণা মুখ ফিরাইল।

রায় বাহাদুর বলিলেন, "এ কথা সত্য যে তোমার বাবাকে আমি বহুদিন হতে চিনতুম—রাধাচরণ আমায় অনেকদিক হতে অনেকদিন কাজ করেছে—সে কাজ স্পাইয়ের কাজ। আমার বর্ত্তমান উন্নতির জন্যে আমি তার কাছে খানিকটা কৃতজ্ঞ আছি। এই সুত্রেই সে যেদিন কন্যাদায়ে বিব্রত হয়ে এসে আমার দুই-পা জড়িয়ে ধরেছিল, সেদিন আমি তোমায় গ্রহণ করলুম—সে তোমার মূল্য স্বরূপ টাকা নিয়ে ফিরলো। তার পরেও সে মাস মাস আমার কাছ হতে মাসোহারা পেয়েছে, মাঝে-মাঝে এসে দুশো তিনশো টাকাও নিয়ে গেছে। আবার সেদিন টাকা চেয়ে পাঠিয়েছিল, আমি দেইনি। আজ আমি তার কাছে যা শুনেছি—"

কৃষ্ণা ধীরকণ্ঠে বলিল, "আমি তা জানি।"

রায় বাহাদুর প্রশ্ন করিলেন, "তুমি আগেও সব জানতে এবং জেনে শুনেই রাধাচরণের বশ্যতা স্বীকার করেছিলে শুনলুম—"

কৃষ্ণা চুপ করিয়া রহিল—।

রায় বাহাদুর গর্জনের সুরে বলিলেন, "তোমার মা অসতী দুশ্চরিত্রা ছিলেন,—তুমি রাধাচরণের মেয়ে নও, শক্তিময় তোমার পিতা—এসব কথা তুমি জানতে ?"

রায় বাহাদুর জিজ্ঞাসুনেত্রে কৃষ্ণার পানে চাহিলেন—কিন্তু কৃষ্ণা উত্তর দিল না।

রায় বাহাদুর উঠিয়া দাঁড়াইলেন—"জেনে শুনে কেবল মায়ের কলঙ্ক ঢাকবার জন্যে তুমি আত্ম-সমর্পণ করেছো কৃষ্ণা,—বলতে পারোনি তুমি বিয়ে করবে না—?"

কৃষ্ণা মুখ তুলিয়া কি বলিতে গিয়া চুপ করিয়া গেল।—

রায় বাহাদুর ঘরের মধ্যে পাদচারণা করিয়া আসিয়া ঠিক কৃষ্ণার সামনে দাঁড়াইলেন, বলিলেন, "তারপর তোমার দিক দিয়েও কথা আছে কৃষ্ণা—যে কথা একদিন সুলেখাও আমাকে বলেছিল কিন্তু সেদিন তার কথা বিশ্বাস করিনি। শঙ্কর তোমার কে—সেই কথাটাবল দেখি ?"

"শঙ্কর—"

কৃষ্ণা মুখ নত করিয়াছিল, সগর্ব্বে মুখ তুলিল, "শঙ্কর কে সে কথা আপনাকে বললে আপনি কি বিশ্বাস করবেন ? আজ শঙ্করকে আমি দাদা বলি, কিন্তু একদিন শঙ্করের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার আশাও করেছিলুম।"

রায় বাহাদুর বসিলেন—

হাল্‌কা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আমি জানি পরশু রাত্রে শঙ্কর এসেছিল তার দলবল নিয়ে, তাদের আমার ঘরের সন্ধান তুমিই দিয়েছিলে—"

কৃষ্ণা বাধা দিল—"মিথ্যা কথা,—আমি নই,—আপনারই—"

বলিতে বলিতে সে থামিয়া গেল—

রায় বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে সন্ধান দিয়েছিল বল—?"

আর্দ্রকণ্ঠে কৃষ্ণা বলিল, "আপনার দৌহিত্রী ইরা—সে এদেরই দলে আছে—আমি নই।"

রায় বাহাদুর অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন—তাহার পর বলিলেন, "আমি সব বুঝেছি, সব জেনেছি কৃষ্ণা। তোমার মামাকে এই মাত্র টেলিগ্রাম করে দিয়েছি, তিনি যত সত্বর পারেন তোমায় নিয়ে যাবেন। তোমার যাবজ্জীবনের উপায় আমি ঠিক করে রাখব—অজয় সে ভার নেবে। পুলিসের হ্যাঙ্গাম আমি মিটিয়ে দিলুম, ওদের জানিয়ে দিলুম আমার কিছুই যায়নি, মেয়েরা মিথ্যে গোলমাল করে পুলিসে খবর দিয়েছে। যাক, তুমি যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত থেকো কৃষ্ণা—আমি তোমায় আর এখানে রেখে কষ্ট দেব না।"

কৃষ্ণা আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। অনেক কথা সে বলিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল কিন্তু অতি গম্ভীর রায় বাহাদুরের সামনে সে-সব কথার একটিও বলিতে পারিল না।

চলিতে চলিতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া রায় বাহাদুর বলিলেন, "রাধাচরণের ব্যবস্থা আমি করছি—তাকে আমি যে সহজে ছেড়ে দেব না, সে কথাটা জেনে রেখো—

তিনি বাহির হইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণা ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিল।—

২৬

সুরবালা অজয়কে ডাকিতে পাঠাইলেন—ব্যাপার বড় গুরুতর, অজয়ের তাড়াতাড়ি আসা চাই।

অজয় যখন আসিল তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। রায় বাহাদুর বাড়ী নাই, পুলিস কমিশনারের বাড়ী গিয়াছেন—

এ ঘটনাটাকে তিনি মুছিয়া ফেলিতে চান। পারিবারিক কলঙ্ক প্রকাশ হইয়া পড়িবে; যদি এ মামলা কোর্ট পর্য্যন্ত যায়,—তাঁহার মুখ দেখাইবার পথ থাকিবে না।

শঙ্কর তাহার পরিচিত,—তাহাকে কোনদিন চোখে না দেখিলেও সে যে অনেক কাজে লিপ্ত আছে, জেল খাটিযাছে তাহা তিনি জানেম। পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ড রমেশ গাঙ্গুলী একদিন রায় বাহাদুরের অধীনে কাজ করিয়াছেন—তাঁহার পুত্রের জন্য তিনিই কতদিন রমেশ গাঙ্গুলীকে সতর্ক করিয়াছেন।

আজ রমেশ গাঙ্গুলী কাজ ছাড়িয়া দিয়াছেন। পত্নীর মৃত্যুর পর তিনি কাজ ছাড়িয়া দিয়া দেওঘরে বাস করিতেছেন, বাংলার বা বাঙ্গালীর সঙ্গে কোন সম্পর্কই তিনি আর রাখেন নাই।

অজয় এ বাড়ী আসিয়াই মামার খোঁজ লইল। সকালেও সে আসিয়াছিল,—এখানে থাকা নিষ্প্রয়োজন জানিয়াই সে নিজের বাড়ী চলিয়া গিয়াছিল।

সিনেমায় যাইবার জন্য সে সবে প্রস্তুত হইতেছিল—মায়ের জরুরী আহ্বানে আসিলেও মন তাহার বিশেষ খুসী হয় নাই।

"ব্যাপার কি বলতো মা,—তোমার জন্যে আর তো কিছু দেখবার বা করবার উপায় নেই দেখছি। কি হয়েছে বল্ দেখি ?"

মা বলিলেন, "দরকার না থাকলে কি ডেকে পাঠাই অজু,—এদিকে যে ভয়ানক ব্যাপার বেধেছে,—তোর মামা চিরকালের মত কৃষ্ণাকে পাঠিয়ে দিচ্ছে তার মামার বাড়ীতে।"

অজয় জিজ্ঞাসা করিল, "হঠাৎ এ করবার মানে ?"

মা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "হঠাৎই বটে—সেই লোকটা এসেই না এই কাণ্ড বাধালে—"

একে একে সমস্ত কথা পুত্রের কাছে বলিয়া তিনি বলিলেন, "এখন উপায় কি বল দেখি অজু,—মেয়েটাকে সত্যি পাঠিয়ে দেওয়া ভালো—না এখানে রাখা ভালো ? আমি নিজে ভেবে কিছু ঠিক করতে না পেরেই তোকে ডেকে পাঠিয়েছি।"

উত্তেজিত কণ্ঠে অজয় বলিল, "ক্ষেপেছো মা, ঘরের বউ পাঠিয়ে দেবো বললেই দেওয়া যায় কি ? মামার তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, ভালো মন্দ কিছু বুঝবার শক্তি তাঁর নেই। সে শক্তি যদি থাকতো—তিনি কখনই নাতনীর বয়সী একটি মেয়েকে বিয়ে করতে পারতেন না। হিন্দুর বিয়ে—এ সহজে যদি ফিরানো যেতো—তাহ'লে তো ভাবনাই ছিল না। ও-সব কথা থাক, আমি দেখছি কতদূর কি হয়।"

কৃষ্ণার রুদ্ধদ্বারে আঘাত করিয়া সে ডাকিল—"দরজা খোল মামী তোমার সঙ্গে দরকারী কথা আছে—।"

মামী, তা সে-ও জানতো না, আমিও জানতুম না। এখনই আমি জানলুম—আর সে-ও পরশু জেনে গেছে।"

কৃষ্ণা অন্যমনস্কভাবে কেবল মাথা কাত করিল।—

অজয় বলিল, "একটা সত্য কথা কেবল আমায় জানাও মামী,—শঙ্করকে আজ তুমি কি চোখে দেখ—কেবল সেইটার উপরই সব কিছু নির্ভর করবে জেনো।"

কৃষ্ণা স্থির দৃষ্টি অজয়ের মুখের উপর রাখিল—বলিল, "আপনার কাছে সত্য কথাই বলব অজয় বাবু,—একদিন কুমারী অবস্থায় আশা ছিল—শঙ্কর-দা আমায় বিয়ে করে, আমার মাকে আমার ভাবনার দায় হতে মুক্তি দেবেন। আজ আমি শঙ্করদাকে আমার গুরুর আসনে স্থান দিয়েছি—যখনই আমার মন বিচলিত হয়—আমি শঙ্করদার উপদেশ মনে করে শক্তি পাই। তিনি আমার বড় ভাই—তিনি আমার গুরু অজয় বাবু—।"

অজয় বলিল, "আর কিছু ভাবতে হবেনা মামী, আমি তোমায় চিনেছি, তোমায় বুঝেছি। মামাকে আমি ঠিক পথে নিয়ে আসব দেখে নিয়ো। তবে তোমায় একটা কথা বলে রাখি বাপু, এর পর মামা যখন বলবেন থাকো—আর তুমি তোমার সেই যাদব-দা এলে তার সঙ্গে চলে যেতে চাইবে সেটি হবে না।"

সে উঠিল।

২৭

ইরা দার্জ্জিলিং থাকিতে খবর পাইয়াছে—চঞ্চল হইয়া সে আসিবার সঙ্গে সঙ্গে সুলেখাও চলিয়া আসিলেন।

আগের দিন যাদব আসিয়াছিল।

অজয় বলিয়াছে—"তুমি ক্ষেপেছো,—মামীর এখন সংসার ভাসিয়ে গেলে কি চলে—আমাদের দেখা শুনা করবে কে? দেখছো তো—সবই আছে তবু কিছুই নেই। ওই মামীটি আছেন তাই মামার বাড়ী এসে দু'দণ্ড টিকতে পারি একটু চা খেতে পাই। যাই বল—মামীটি আমার ভারি লক্ষ্মী, এমন লক্ষ্মীকে আমরা পাঠাতে পারবো না বাপু।"

চতুর যাদব বুঝিয়াছে ইহাদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে কোন কারণেই হোক মনোমালিন্য হইয়াছিল, যাহার জন্য রায় বাহাদুর কৃষ্ণাকে লইয়া যাইবার জন্য টেলিগ্রাম করিয়াছেন।

অজয় বলিল, "এসেছো দু'দিন থাকো, কলকাতা সহর দেখে শুনে যাও, গিয়ে মামীর মামাকে সব বলো।"

সত্যই যাদব ভারি খুসি হইয়াছে। এত বড় ঘরে কৃষ্ণা আসিয়াছে সে তাহা ধারণাও করিতে পারে নাই। দীর্ঘ দিন ধরিয়া সে নাম মুখেও আনে নাই,—অবাধ্য মনকে বার বার বুঝাইয়াছে কৃষ্ণা কৃষ্ণা মারা গিয়াছে।

কৃষ্ণার চোখে জল মুখে হাসি—

সে বলিল, "আমি সত্যিই বড় সুখে আছি যাদব-দা, মামাকে বলো—আমার কোন দুঃখ কষ্ট নেই, মেয়ে জামাই, নাতনী, ভাগনে—সব নিয়ে আমি ভারি আনন্দে আছি।"

যাদব দু'দিন থাকিতে পারিল না, বাড়ীতে অসুস্থ রোগী আছে, একটা দিন তাহার কোথাও থাকা চলে না।

অজয় বলিয়া দিল, "আমি এই হপ্তাতেই মামীকে নিয়ে তাঁকে দেখতে যাব। যদি তাঁকে আনার মত অবস্থা থাকে, নিয়ে আসব, এই বাড়ীতেই রেখে আমি তাঁর চিকিৎসা করব—তাঁকে বলে রেখো।"

যাদব চলিয়া যাওয়ার পরদিন ইরা ও সুলেখা আসিয়া পৌঁছাইল।

মাকে বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিয়া ইরা দাদামহাশয়ের বাড়ী আসিল—

কৃষ্ণা স-সম্ভ্রমে তাহাকে বসিতে দিল—অজয় বাহির বাড়ী হইতে সংবাদ পাইয়া ভিতরে আসিল—

সহাস্য মুখে বলিল—"আসুন, আসুন মহাশয়া, আমি—আমার মামার বাড়ীর তরফ হতে আপনাকে অভ্যর্থনা করছি।"

আরক্ত মুখে ইরা বলিল, "ঠাট্টা করো না অজু মামা, মাত্রাটা বড্ড বেশী রকম ছাড়িয়ে যাচ্ছে—সহ্য হচ্ছে না।"

অজয় বলিল, "অত্যন্ত অন্যায় হচ্ছে—কিন্তু দেবী, বরাভয় দাও তো একটা কথা বলি।"

[illegible]া বলিল, "বল, অভয় দিলুম—"

[illegible]জয় চিন্তিতের ভাবে বলিল, "একটা প্রশ্নের সমাধান কিছুতেই করতে পারলুম না,—মামী বেচারাকে প্রথমটায় পাকড়েছিলুম, [illegible]নি কেঁদেই অস্থির—বাধ্য হয়ে ওঁকে ছাড়ান দিলুম। এখন

তোমায় সেই প্রশ্নটাই করছি—ঠিক উত্তর দিয়ো কিন্তু—লুকিয়ে গেলে চলবে না বলে রাখছি।"

ইরা হাসিয়া বলিল, "লুকানোর মত কোন কাজ করিনি অজু মামা, বল তুমি কি বলবে।"

অজয় বলিল, "করেছো বই কি, অন্ততঃ পক্ষে একটি কাজ করেছো, সেটি শঙ্করকে এ-বাড়ীর গুপ্ত আল্‌মারীর কথা বলে দেওয়া—বল সত্যি করেছি কিনা—।"

ইরা মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "আমি সেই কথাই বলতে এসেছি অজু মামা, এই মাত্র দাদুকে সেই কথাই জানিয়ে এলুম। দার্জ্জিলিং থাকতে তোমার পত্রখানা কাল পেয়েই আমি আর অপেক্ষা করতে পারলুম না। মাকে কিছু বলিনি—মা জানলে যা না তাই বলবেন। আমি ভাবলুম—আমার দোষে এই নির্দ্দোষী মেয়েটা কেন নির্য্যাতিতা হবে—কেন সে মিথ্যা অপবাদের বোঝা মাথায় নিয়ে চলে যাবে—তাই নিজের দোষ স্বীকার করতে আমি এসেছি অজু মামা—।"

অজয় গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিল, "তোমার সৎ সাহসকে ধন্যবাদ দিচ্ছি ভাগনী। অনেক কাজ করেছো তুমি, এখনও আর একটা কাজ বাকি, যা করলে সত্য তুমি এই দুর্ভাগিনী মেয়েটিকে বাঁচাতে পারো—"

ইরা জিজ্ঞাসা করিল, "সেটি কি?"

অজয় উত্তর দিল, "বিয়ে করতে হবে।"

"বিয়ে—"

ইরা হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠে—"ওইটি মাপ কর ও কাজ পারবো না।"

পরম বিস্ময়ে অজয় বলিল, "তা বললে হবে না ইরা। মামা আমাদের এই ছেলেমানুষ মামীকে যে দাগী করে রাখবেন চিরকাল তা হবে না। আমার মামী সেইজন্যেই প্রস্তাব করেছেন—"

কৃষ্ণা সঙ্গে সঙ্গে বলিল—"যে শঙ্করদার সঙ্গে তোমার বিয়েটা দিয়ে শঙ্করদাকে সংসারী করব।"

অজয় বলিল, "আমিও শঙ্করকে এ কথা বলেছি—আর মামীকে বাঁচানোর জন্যে শঙ্করও রাজি হয়েছে ভাগনী, কেবল তোমার সম্মত্তির অপেক্ষা মাত্র।"

ইরা একটু হাসিল, বলিল, "এর মধ্যে সব যে ঠিক ঠাক্ও করে ফেলেছো দেখছি। আচ্ছা, আমি দু'দিন পরে ঠিক করে আমার মতামত জানাব মামা—আজই জানাতে পারলুম না বলে ক্ষমা কোরো—।"

অজয় বলিল, "বেশ, রাজি ; কিন্তু যদি মত হয়—এই সামনের মাঘ মাসে, এগারোই যেদিন আছে সেইদিনেই আমি কন্যা সম্প্রদান করতে চাই। কন্যার বাপ-মা যে এই বিয়েতে যোগ দেবেন না—তা জানি, কাজেই আমিই কন্যা-কর্ত্তা হয়ে সাধ মিটাব ইরা, তখন যেন আপত্তি করো না।"

ইরা আবার হাসিল।

ইরার বিবাহ—

দিন এগারোই মাঘ এবং পাত্র শঙ্কর—

শঙ্কর আপত্তি করে নাই। অজয় তাঁহাকে বুঝাইয়াছে—কৃষ্ণাকে শান্তি এবং স্বগৃহে গৃহিণীরূপে রাখিবার জন্য, চাই শঙ্করের এইটুকু ত্যাগ,—শঙ্করের এই ত্যাগই কৃষ্ণাকে সকল আঘাত হইতে রক্ষা করিবে।

শঙ্কর রাজি হইয়াছে।

পুত্রের বিবাহে পিতা আসিয়াছেন—রমেশ গাঙ্গুলী আজ সর্ব্বান্তঃকরণে পুত্রকে ক্ষমা করিয়াছেন।

আজ সাধ্বী স্ত্রীর কথা মনে হয়—

কি যন্ত্রণাই না পাইয়াছেন তিনি,—জীবনের শেষকাল পর্য্যন্ত তিনি নিদারুণ বেদনা বহিয়াই গেলেন—

আজ অশ্রুপ্লুত নয়নে স্বামী তাঁহাকে ডাকিয়া বলেন, "আজ যেখানেই থাকো তুমি—আশীর্ব্বাদ কর তোমার পুত্র, পুত্রবধূকে,—তোমার পুত্রবধূ যেন সুখী হয়, শান্তি পায়, তোমার মত যন্ত্রণা যেন তাকে না সইতে হয়।"

সুলেখা এবং তাঁহার স্বামী আসেন নাই—স্পষ্ট বলিয়া পাঠাইয়াছেন—তাঁহার এ বিবাহে আশীর্ব্বাদ দিবেন না। ইরা, সুশিক্ষিতা, যে তাঁহাদের বুকে এতখানি বেদনা দিবে, তাহা তাঁহারা স্বপ্নে নাই।

অজয় মৃদু হাসিয়া বলিল—"ইটটী মারলেই পাটকেলটী খেতে হয়—দিদি সে কথা ভুলে গেছে। নিজের অতীত জীবনের কাহিনী দিদির আজ মনে নেই—দিদির মেয়ে তার মায়ের কাজই করছে, এ হিসেবে আমি তোমায় "মাতৃপদাঙ্ক অনুসৃতা" বলব ইরা—আমিই সর্ব্ব প্রথম তোমায় আশীর্ব্বাদ করছি তুমি সুখী হও। বুড়ো দাদুকে সব চেয়ে সুখী করেছো তুমি—ভগবানের আশীর্ব্বাদ তুমি লাভ করবে।"

রায় বাহাদুর নব-দম্পতিকে আশীবাদ করিলেন—বিবাহে তিনি যৌতুক দিলেন তাঁহার ধর্ম্মতলার বাড়ী এবং পঁচিশ হাজার টাকা—

কৃষ্ণা মহানন্দে বরণ করিল—কন্যাকর্ত্রী হইয়াছে সে—আনন্দের শেষ তাহার ছিল না।

বিবাহ শেষে দম্পতিকে ঘরে তুলিয়া দিয়া সে যখন নিজের ঘরে প্রবেশ করিল, রায় বাহাদুর তখনও জাগিয়া ছিলেন।

গলায় আঁচল জড়াইয়া কৃষ্ণা ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল —"বলুন, আপনি আমায় ক্ষমা করেছেন—আমার জন্মগত অপরাধ ভুলবেন ?"

তাহার কণ্ঠস্বর কাঁপিতেছিল।

তাহার মাথায় হাত রাখিয়া রায় বাহাদুর বলিলেন, "আমি তোমার সব দোষ ক্ষমা করেছি কৃষ্ণা—।

কৃষ্ণা আবার প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার মুখের উপর দুদিনের কালো ছায়া তখন সরিয়া গিয়াছে, তৃপ্তির হাসিতে ভরিয়া উঠিয়াছে।

শেষ